স্বপ্নের নেশা

মডার্ন কলাম

১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৮

প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর : অনিলকুমার ঘোষ। [illegible] প্রেস। ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : নির্মলেন্দু মণ্ডল

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের

ভালোবাসা ৫০.

নিজেকে দেখা ৩০.

মুখ আর মুখ ৩৫.

দুজন ৩০.

স্বপ্নে দেখা

ইন্দিরা গান্ধীকে আমি স্বপ্নে দেখেছি দু'বার। স্বপ্নের মধ্যে আমি নিজেই যেন একটা গল্পের চরিত্র হয়ে যাই। নিজে যে বাড়িতে থাকি, সে বাড়িটা স্বপ্নে কখনো দেখি না, স্বপ্নে সব অন্যরকম বাড়ি। অন্যরকম বিছানায় শুয়ে থাকি। যে রকম রাস্তা দিয়ে কখনো হাঁটিনি, সেই রকম রাস্তা তৈরি হয়ে যায়। স্বপ্নের মধ্যে আমার নিজের চেহারাটাও বদলে যায় কি না, তাই বা কে জানে! স্বপ্নে কখনো নিজেকে ভালোভাবে দেখা যায় না।

একদিন দেখলুম, মাঠের মাঝখানে একটা সাদা বাড়িতে আমি থাকি। যেন আমি গ্রামদেশে কোনো চাকরি করি, ঐ বাড়িটা আমার কোয়ার্টার। সামনে একটা পুকুর। কিছুদূরে একটা মাঠে একটা বিশাল জনসভা হচ্ছে। খুব চ্যাঁচামেচি। সেখানে বক্তৃতা সেরে, এক গাদা দেহরক্ষী সমেত হাঁটতে হাঁটতে ইন্দিরা গান্ধী পুকুর ধারে এলেন। তাঁর সারা গা ঘামে ভেজা। তিনি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি এই পুকুরটায় স্নান করবো, তুমি আমাকে একটা তোয়ালে দিতে পারো?

স্বপ্নটা ঐখানেই শেষ। কী যে এই স্বপ্নের মর্ম, তা কে জানে!

দ্বিতীয়টি কলকাতায় মাটির তলায় একটি রেস্তোরাঁয়। কলকাতা শহরে এমন কোনো বাস্তব রেস্তোরাঁ নেই, কিন্তু স্বপ্নে সেটির অনেক ডিটেইলস পর্যন্ত দেখা গেল, যেমন, দেয়ালগুলি পাথরের, তাতে অন্য কোনো রং নেই। দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে ঢাল ও তলোয়ার আঁটা, এখানকার আলোগুলি মশালের অনুকরণে। সাত-আটটি টেবিল, তারমধ্যে ঠিক মাঝখানেরটায় আমরা কয়েকজন বন্ধু গোল হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছি, সামনে সুরার পাত্র, অল্প আহার্য মাত্র।

সাদা পোশাক পরা বেয়ারারা আসছে যাচ্ছে, সবকটি টেবিলের আড্ডা মিলে একটা গুঞ্জন শব্দ। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে হঠাৎ নেমে এলেন ইন্দিরা গান্ধী, বেশ দামী একটা সিল্কের শাড়ি পরা। এবারেও তাঁর সারা মুখ ঘামে মাখা, তবে সঙ্গে আর কেউ নেই। অন্য কারুকে না খুঁজে সোজা, দ্রুত তিনি চলে এলেন আমাদের টেবিলের দিকে।

একটাও চেয়ার ফাঁকা নেই. আমরা দু'একজন উঠে দাঁড়ালুম বটে, কিন্তু তিনি বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তারপর টেবিলের ওপরেই বসে পড়ে পা দোলাতে দোলাতে বললেন, কী মুশকিল বলো তো, একটুও আড্ডা মারার সময় পাই না···তোমরা কী রকম মজায় আছো···আমি যে এখানে এসেছি আর কারুকে বলো না··

আরও একবার, তবে সেটাকে ঠিক স্বপ্ন বলা যায় না, দিবা-স্বপ্ন বলা যেতে পারে। ছুটির দুপুরবেলা, আমি গেঞ্জি পরে শুয়ে আছি, চোখের সামনে লম্বা করে খবরের কাগজ মেলা, একটু দূরে রেডিওতে সরোদে হাম্বীর রাগ বাজছে, আমার চোখে নেমে আসছে তন্দ্রা। বাজনাটা শেষ হয়ে রেডিওতে বাংলা খবর শুরু হলো, সে বছর আসাম ও পশ্চিম বাংলায় ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল, খবরের কাগজেও বন্যার অনেক ছবি, খবরে বলা হচ্ছে যে ইন্দিরা গান্ধী হেলিকপ্টার চড়ে আসামের বন্যা দেখছেন। দৃশ্যটা যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, হেলিকপ্টারের জানলার কাছে বসে আছেন ইন্দিরা গান্ধী, নিচের বহুদূর বিস্তৃত উজ্জ্বল জলরাশি, মাঝে মাঝে জেগে থাকা ছাতার মতন গাছের মাথা, মোচার খোলার মতন কয়েকটা নৌকো···সেইসব দেখতে দেখতে তাঁর মুখ ফস্কে বেরিয়ে এলো, বাঃ কী সুন্দর!

অল্প বয়েসে যে-সব চলচ্চিত্রের নায়িকারা ছিল আমার কল্পনার জগতের দেবী, বিরলে বসে যাদের কথা ধ্যান করতাম, যাদের স্বপ্নে দেখলে খুব খুশী হতাম, তারা কেউ কিন্তু কোনোদিন স্বপ্নে আসেনি।

স্বপ্নে তাদের সঙ্গে প্রেমালাপের তো কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু সে সুযোগ ঘটলো না একবারও। এলিজাবেথ টেলরকে একদিন আমি খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম, একই হোটেলের লবিতে, সেখানে তেমন একটা ভিড়ও ছিল না, ইচ্ছে করলে তার সঙ্গে আমি আলাপ-পরিচয়ও করতে পারতাম, কিন্তু কোনো কথা বলিনি লাজুকতাবশত। তখন এলিজাবেথ টেলর সবেমাত্র তৃতীয়বার বিয়ে করেছেন, বেশ যুবতী, একটা পত্রিকা পড়তে পড়তে মুচকি মুচকি হাসছিল। সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে মনটাকে খুব একাগ্র করে ভাবলুম, আজ এলিজাবেথ টেলরকে স্বপ্নে ধরা দিতেই হবে। সে রাতে আমার ঘুমই এলো না!

সুচিত্রা মিত্রর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় ছিল না, শুধু রেডিও-রেকর্ডে তাঁর গান শুনেছি ও ছাপা-ছবি দেখেছি, সেই সময় অকস্মাৎ তিনি একবার আমার স্বপ্নে এসে উপস্থিত। খুব চওড়া পাড় শাড়ি পরা, কপালে একটা বড় টিপ, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তিনি আমাকে খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে, তাঁর বাঁশির মতন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিমতলা শ্মশান ঘাট চেনো। আমাকে রাস্তাটা একটু দেখিয়ে দেবে? এরকম একটা অস্বাভাবিক প্রশ্নেও আমি একটুও বিস্মিত বোধ করলুম না, আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলুম। পরবর্তী দৃশ্য নিমতলা শ্মশান, খুব বৃষ্টি পড়ছে সেখানে, একটাও চুল্লি জ্বলছে না, কোনো মানুষজন নেই। বৃষ্টি দেখে সুচিত্রা মিত্র খুব খুশি হয়ে বালিকার মতন ছুটোছুটি করতে লাগলেন, একবার নেমে গেলেন জলের ধারে, জল ছেটাতে লাগলেন আপন মনে, বারবার ওপরে উঠে এসে বললেন, আমার শ্মশানে বৃষ্টি দেখতে খুব ভালো লাগে। ভাগ্যিস আজ এলাম!

স্বপ্নে তিনি এক লাইনও গান গেয়ে ওঠেননি, বরং তাঁর চলার ভঙ্গিতে ছিল নাচের ছন্দ। এক একটা স্বপ্ন সকালবেলা ফিকে হয়ে আসে, রোদ চড়ে গেলেই একেবারে মুছে যায় মন থেকে।

এক একটা স্বপ্ন এমন তীব্র যে ঘুম ভেঙে যায়, মনে থাকে চিরকালের মতন। এই স্বপ্নটা সে রকম।

এ রকমই আর একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম আমার স্ত্রী স্বাতীকে নিয়ে।

তখন আমি মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বেশ চমৎকার দিন কাটছে। তারই মধ্যে এক রাত্রে এলো এই ভয়ংকর ও মজার স্বপ্নটি।

একটা বেশ পুরোনো আমলের বাড়ি, জমিদার-বাড়ির মতনই মনে হয়, তখন সেটা বিয়ে বাড়ি, বাইরে শানাই বাজছে, অনেক লোকজন যাচ্ছে আসছে, সিল্কের শাড়ি পরা সুন্দরীরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে তরতর করে, বাতাসে নানা রকম রান্নার গন্ধ। প্রথমে মনে হলো, অচেনা কোনো বিয়ে বাড়িতে আমি ভুল করে ঢুকে পড়েছি, তারপর দু'একটি চেনা মুখ চোখে পড়লো। বাইরের দরজায় সমবেত উলুর শব্দ, বরের গাড়ি এসে গেছে।

তারপর দেখি বিয়ের কনের সাজে যে-মেয়েটি অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এলো, সে আর কেউ নয়, স্বাতী, দারুণ দেখাচ্ছে তাকে, আমাকে সে গ্রাহ্য না করেই ছুটে চলে গেল অন্য ঘরে। আমি প্যান্ট-শার্ট ও হাওয়াই চটি পরে আছি, তা হলে তো এটা আমাদের বিয়ের দৃশ্যের পুনরভিনয় হতে পারে না। ব্যাপারটা কী? যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই পাশ থেকে একজন বলে উঠলো, ব্যাপারটা বুঝবে না, স্বাতী বিধবা হয়ে আবার বিয়ে করছে। আজ বড় আনন্দের দিন।

এক দঙ্গল মেয়ে হাসতে হাসতে ছুটে এলো সেখানে। সবাই আনন্দ করছে, আমারও আনন্দ করা উচিত, আমিও খুব হাসতে লাগলুম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা খটকা রয়ে গেল। বিধবা হয়ে স্বাতীর বিয়ে করার কী যেন একটা অসুবিধে আছে। অথচ সেটা আমার মনে পড়ছে না।

উলু, শানাই ও শাঁখ বাজার শব্দে আমার দিশেহারার মতন অবস্থা। ফার্স্ট ব্যাচ বসে পড়েছে, চলো চলো, বলে একজন আমার হাত ধরে টানতে লাগলো, আমিও পা বাড়াতে উদ্যত হলুম খাবার জায়গার দিকে, তখনই ঠিক পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো স্বাতী, আমাকে বকুনি দিয়ে বললো, তোমাকে দিয়ে একটা কাজ হয় না! ফুলের মালা-টালা কিছু আসেনি, তুমি একটু দেখতে পারো না? একটু দোকানে গিয়ে দ্যাখো।

বকুনি খেয়ে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি বলে নামতে লাগলুম সিঁড়ি দিয়ে আর ভাবতে লাগলুম, বিধবা হিসেবে স্বাতী বিয়ে করছে, এতো সত্যিই খুব আনন্দের কথা, কিন্তু কী যেন একটা বাধা আছে, কী যেন, কী যেন…

তারপরই সেটা মনে পড়লো। এই যাঃ! আমি যে এখনো বেঁচে আছি তাকি সবাই ভুলে গেছে? আমার মনে পড়লেও, একথাটা এখন অন্যদের জানানো কি ঠিক হবে? এমন একটা সুন্দর উৎসব নষ্ট করে দেওয়া কি আমার উচিত? সেই বিয়েতে যে বর, সে দিব্যি সিল্কের জামা-টামা পরে, মাথায় টোপর দিয়ে বসে ছিল বন্ধুদের সঙ্গে। বেশ ফর্সা, পাতলা চেহারা, সুপুরুষই মনে হয়। কিন্তু তার মুখখানা আমার দেখা হয়নি। কিছুতেই তার মুখখানা নজরে এলো না। চেনাশুনো কোনো মুখ হলে তা নিয়ে স্বাতীকে পরে খুব রাগানো যেত!

২

লণ্ডন ছাড়ার আগে বন্ধুরা বললো, আর দু'চারটে দিন থেকে যাও না, এখানকার পুজোটা দেখে যাবে। কিন্তু আমায় তখন আফ্রিকা টানছে। দুর্গা ঠাকুর কিংবা দুর্গোৎসবের চেয়ে আফ্রিকার টান আমার কাছে অনেক বেশি। এর আগে আমি মিশরে

গিয়েছিলুম একবার, কিন্তু সেটা নামেই শুধু আফ্রিকা মহাদেশে, এখনকার মিশর একটি আরব দেশ। কালো মানুষ ও সিংহের দেশ প্রকৃত আফ্রিকায় এই আমার প্রথম পদার্পণ।

এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানের যাত্রীরা অনেকেই প্রবাসী ভারতীয়, বাঙালির সংখ্যাও যথেষ্ট, তারা পুজো দেখতে দেশে আসছে। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হলো, আমি লণ্ডন থেকে সোজা দেশে না ফিরে মাঝপথে নেমে পড়বো শুনে তারা অনেকেই অবাক। একসময় আমরা যেমন কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে পুজো দেখতে যেতাম, সেইরকমই এইসব প্রবাসীরা বিলিতি কাপড় জামা নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম বাংলার আত্মীয় স্বজনদের জন্য।

কেনিয়ায় ঠিক কত বাঙালি আছে, সে সম্পর্কে আমার ঠিক ধারণা ছিল না। আমার ওঠবার কথা তন্ময় দত্তের বাড়িতে। চাকরি বদল করার ব্যাপারে তার বিশ্ব রেকর্ড করার বিশেষ দেরি নেই বোধহয়। সে যে কখন কোন্ দেশে থাকে, তা ধরা মুস্কিল। দৈবাৎ নাইরোবি শহরে তার অবস্থানের খবর পেয়েই আমি আর এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি, তার বাড়িতে আতিথ্য নেবার প্রস্তাব পেয়েই আমি প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছি। বিমানবন্দরে আমাকে অবাক করে দিয়ে দু'হাত মেলে অভ্যর্থনা জানালো আমার আর এক বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধু অমল লাহিড়ী, সে ছিল নাইজিরিয়ার লাগোস শহরে, মাত্র কয়েকদিন আগে সপরিবারে এসেছে নাইরোবিতে। আড্ডা গুলজার হবার সম্ভাবনায় আমি উৎফুল্ল হলুম।

নাইরোবি শহরটি আধা বিলিতি ধাঁচের, প্রশস্ত রাস্তাঘাট বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল, গাড়িগুলি জাপানী ও মার্কিন, বাড়িগুলি আধুনিক স্থাপত্যরীতির, কিন্তু মানুষগুলো কালো ও খয়েরি রঙের। দোকানপাটের সংখ্যা অনেক, অধিকাংশ দোকানেরই মালিক-কর্মচারী গুজরাতি বা সর্দারজি। শহরের একদিকে লম্বা-টানা

দেওয়াল, তার ওপাশে সংরক্ষিত অরণ্য। যে-হেতু শহরের আয়তনের তুলনায় অরণ্যটি সুবিশাল, তাই একথা বলা যেতে পারে যে শহরের মানুষগুলোকেই দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, অরণ্যের প্রাণীরা সব স্বাধীন।

নাইরোবি শহরে এসে প্রথম দিনেই সিংহ দর্শনের কথা গাঁজাখুরি মনে হতে পারে, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাই ঘটে গেল। দু'একটা সিংহ নাকি মাঝে মাঝে ছিটকে ছাটকে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, একবার বিমান বন্দরেও এক সিংহ দম্পতি এসে আস্তানা গেড়ে দু'তিন দিন বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি অবশ্য সেসব দেখিনি, তবে প্রথম দেখা দিনই বিকেলে অমল আর মঞ্জুর সঙ্গে গাড়ি নিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করার খানিক পরেই দেখা গেল একটা হরিণের পাল এবং পাশের ঘাসঝোপ থেকে হলুদ বজ্রের মতন লাফ দিয়ে এসে পড়লো একটি সিংহীনী। আমাদের চোখের সামনে সে নির্লজ্জভাবে মড়মড় করে হরিণের হাড় চিবোতে লাগলো।

প্রথম দিনেই সিংহ ছাড়া আর একটি ব্যাপার দেখে আমি বিস্ময়-মুগ্ধ হয়েছিলুম। তন্ময়ের অ্যাপার্টমেণ্টটি বেশ শৌখিন পাড়ায়, অত্যাধুনিক এক গৃহ-গুচ্ছের মধ্যে। এই গৃহ-গুচ্ছটির মালিকানা কেনিয়ার প্রয়াত জাতীয় নেতা জেমো কেনিয়াট্টার অনেক পত্নীর মধ্যে একজন। সেখানে লোক এলো বাথরুম পরিষ্কার করতে। তাকে দেখে আমি চমৎকৃত। বার্নিস করা কালো রঙের সে এক স্বাস্থ্যবান যুবা, প্যাণ্ট শার্ট ও জুতো-মোজা পরা, সে গুন গুন করে গান গাইছিল। আমি জুতো-মোজা পরা, সঙ্গীত রসিক জমাদার কলকাতা শহরে এ পর্যন্ত দেখিনি, ভারতের অন্য কোনও শহরে আছে বলেও শুনিনি।

তন্ময়ের বাড়ির চেয়ে অমল-মঞ্জুর বাড়িতেই আড্ডা জমে বেশি। তন্ময় লাজুক ও একাচোরা স্বভাবের, কাজের সময়ের পরে সে বইতে

ও রেকর্ড সঙ্গীতে ডুবে থাকতে ভালোবাসে। অমল-মঞ্জু যেখানেই যায়, সেখানেই যায়, সেখানেই হইচই করে জমিয়ে তোলে, ওদের ব্যক্তিত্বের টানে অনেকেই আসে। ওদের অ্যাপার্টমেণ্টটা শহরের কেন্দ্রস্থলে, বাজার করার জন্যও সেখানে অনেককে আসতে হয়। সে বাড়িতে গিয়ে শুনি দুর্গা পুজোর প্রস্তুতির মিটিং শুরু হয়ে গেছে।

নাইরোবি শহরে সাতষট্টিটা বাঙালি পরিবার। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা মিলেমিশে বেশ কিছু অনুষ্ঠান করেন, তবে দুর্গা পুজোর ব্যাপারে বাংলাদেশিরা দূরে থাকেন সংগত কারণেই। কেনিয়ার অন্যান্য শহর থেকেও এই উপলক্ষে অনেক বাঙালি এসে পড়েন নাইরোবিতে।

আমেরিকায় দু'একটি শহরে বাঙালিদের দুর্গা পুজো আমি দেখেছি এর আগে। সেখানে পুজো হয় শুধু শনিবার। যে-বছর পুজোর তারিখ যাই-ই পড়ুক, মার্কিন বাঙালিরা তার কাছাকাছি শনিবারটাই বেছে নেন। ক্লিভল্যাণ্ড শহরে একই দিনে পরপর চার ঘণ্টায় সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী-বিজয়া সাঙ্গ হয়ে গেল, তারপর খাওয়া দাওয়া!

সেই তুলনায় নাইরোবির বাঙালিরা যথেষ্ট নিষ্ঠাবান। তাঁরা চারদিন ধরেই পুজো করবেন। কয়েকজন ছুটির দরখাস্ত করে ফেলেছেন। শুভঙ্কর নামে একটি যুবকের দেখলুম দারুণ উৎসাহ, একজন শিক্ষক চট্টোপাধ্যায় বামুন, তিনি হবেন পুরোহিত। মেয়েরা কবে কে কী রান্নার ভার নেবেন তাও ঠিক হয়ে গেল। প্রতিটি পরিবারের চাঁদা চারশো শিলিং (এক কেনিয়ান শিলিং বারো আনার মতন)।

পুজো হবে কোথায়? রাস্তায় প্যাণ্ডেল বাঁধবার নিয়ম নেই। শিখদের একটি গুরুদ্বার পাওয়া যাবে বিনা ভাড়ায়, এদেশে শিখ-হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চমৎকার সহযোগিতা আছে। বিদেশে

পাকিস্তানিরাও ভারতীয়দের খুব, বন্ধু হয়, এমন দেখেছি। সব ব্যবস্থা পাকা হবার পর প্রশ্ন উঠলো, প্রতিমার কী হবে? কলকাতা থেকে আনাবার সময় নেই, খরচও অনেক। নাইরোরিতে প্রতিমা তৈরি করার মতন কেউ নেই, তবে একজন মারাঠি ইঞ্জিনিয়ার আছেন, যিনি ছবি আঁকতে পারেন। তাকে অনুরোধ করে ক্যানভাসে আঁকানো হলো ছোট মাপের ছবি, তাতে দুর্গার শাড়ি পরার ধরন দেখে মনে হয় মারাঠি মহিলা! তাতে কোনও দোষ নেই, দুর্গা ঠাকুরকে বাঙালি হতে হবে, এমন কোনও কথা আছে কী?

পুজোয় যোগদানের জন্য আমিও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলুম। গুরুদ্বারে মারাঠি মহিলার মতন দুর্গার পুজো যেমন জমে তা দেখার কৌতূহল আমার ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সুযোগ আমার হলো না। তার আগেই বিশ্ববিখ্যাত সেরিংগেটি জঙ্গলে সফরের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল, নাইরোবি শহরের পুজো ছেড়ে আমার সঙ্গে বন্ধুরা কেউ যেতে পারবে না, আমাকে যেতে হলো একা।

ছোট প্লেনে করে যেখানে গিয়ে নামবার কথা, সেই এয়ার স্ট্রিপে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের মতন চেহারার তিনটি হাতি। প্লেনটা চক্কর দিতে লাগলো আকাশে, নীচে বন-কর্মীরা বোমা ফাটিয়ে তাড়াতে লাগলো সেই হাতিদের, আমরা উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইলুম প্লেনের জানলায়। সেই বোমার আওয়াজেও দাঁতালো হাতিরা ভয় পায় না, কিন্তু দেখা হলো হাজার হাজার জেব্রা ছুটে পালাচ্ছে।

যাই হোক, নামা হলো একসময়। এই অঞ্চলটির নাম মাসাইমারা, জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুর হোটেল। একা আসার জন্য আমার একটুও খারাপ লাগে না, একা থাকলে অপরিচিতদের সঙ্গে কম কথা বললেও চলে, একেবারে মুখ বুজে থাকলে অরণ্যের নিস্তব্ধতাও শুষে নেওয়া যায় শরীরে।

দিন তিনেক সেই জঙ্গলে থাকবার পর, এক বিকেলে, তাঁবুর সামনে বসে বসে হরিণ ও জিরাফের পালের আনাগোনা দেখছি, একটা জলার পাশে চরছে গোটা দশেক বাইসন, এমন সময় হঠাৎ ঢাকের বাজনার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলুম। মনে মনে হিসেব আছে, আজই বিজয়ার দিন। এ যেন বাংলার বিসর্জনের ঢাকের আওয়াজ! এই জঙ্গলেও দুর্গা পুজো হয় নাকি?

পরে মনে পড়লো, এই জঙ্গলেই মাসাইদের একটা গ্রাম আছে। আজ বোধহয় তাদের কোনো পরব আছে।

৩

শ্রীযুক্ত আর কে নারায়ণের একটি বই সম্প্রতি হাতে এল, 'আ রাইটার্স নাইট মেয়ার'। মনে হল, এই প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক বুঝি লেখকদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পড়তে শুরু করে দেখি, ও হরি, সেসব তো কিছু না, এ যে দেখছি টুকরো টুকরো পাঁচমিশেলি লেখা! নিছক জীবিকা অর্জনের তাড়নাতেই আর কে নারায়ণ বহু বছর ধরে 'হিন্দু' পত্রিকায় সাপ্তাহিক কলম লিখেছেন, সংবাদপত্রের রম্য রচনা যে-রকম হয়, 'হারানো ছাতা', 'অ্যালার্জি', 'মাথা ধরা', 'হিন্দী প্রচার' এই ধরনের ছাতামাথা বিষয়। 'একজন লেখকের দুঃস্বপ্ন' নামেও একটি লেখা আছে অবশ্য, তবে সেটি নিতান্তই একটি অকিঞ্চিৎকর দুঃস্বপ্ন।

পড়তে পড়তে আমার ধারণা হল, বইটির নাম নিয়ে আর কে নারায়ণ একটি নির্মম রসিকতা করেছেন। একজন ঔপন্যাসিককে যে বছরের পর বছর সংবাদপত্রের কলম লিখে যেতে হয়, সেটাই তো সেই লেখকের দুঃস্বপ্ন। তিনখানা উপন্যাস বেরিয়ে যাবার পর, যখন আর কে নারায়ণের যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে, তখনও তাঁর বইয়ের উপার্জনে সংসার চলে না, তিনি নিজে যেচে 'হিন্দু' পত্রিকার

সম্পাদকের কাছে সাপ্তাহিক কলম লেখার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

বছর দশেক আগে উত্তর ভারতের এক রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে আমি হঠাৎ একটি পেপারব্যাক উপন্যাস পেয়েছিলাম, আগের কোনও যাত্রীর ফেলে যাওয়া। তিন চার ঘণ্টা সময় কাটাবার দরকার ছিল, তাই আমি পড়তে শুরু করলাম। বইটির নাম, 'দ্য সিক্রেট অব সান্টা ভিট্টোরিয়া', লেখকের নাম সঠিক মনে নেই, ধরা যাক জন মিচেল। লেখকের ভাষা বেশ ঝকঝকে। একটানা পড়ে যাওয়া যায়, তেমন গভীরতা না থাকলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ইতালির একটি ছোট্ট গ্রামের মানুষজনের ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামের কাহিনীটি কখনও কখনও চোখে জল আনে। বইটি ভাল কিন্তু ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে জমিয়ে রাখার মতন মহৎ কিছু সৃষ্টি নয়, একবার পড়া হয়ে গেলে রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় অনায়াসে।

উপন্যাসটি পাঠে কিছুটা তৃপ্তি পেলেও এর ভূমিকা পড়ে রীতিমতন অপমানিত বোধ করেছিলাম আমি। এই দুশো পাতার উপন্যাসটি রচনার আগে ওই লেখক ইতালির ছোট গ্রামটিতে তথ্য সংগ্রহ এবং "গবেষণা"-র জন্য দুবারে মোট দেড় বছর কাটিয়েছেন, সেই খরচ জুগিয়েছে তাঁর দেশের দুটি ফাউণ্ডেশন, এর পর ওই উপন্যাসটি লিখতে তাঁর সময় লেগেছে বছরখানেক, তখনও তাঁকে সংসার চিন্তা করতে হয়নি। অথচ ওই উপন্যাসটি, আর কে নারায়ণের "গাইড" উপন্যাসের তুলনায় তো বটেই, এমন কি আমাদের বাংলা শারদীয় সংখ্যাগুলিতে যে-সব উপন্যাস উৎপাদিত হয়, তার কোনও কোনওটির তুলনায় বেশ কম নম্বর পাবে!

সাহেব-লেখকদের সুযোগ-সুবিধে কিংবা লেখার বিলাসিতার কথা চিন্তা করে আমাদের গাত্রদাহের কোনও মানে হয় না ঠিকই, তবু কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা মনে আসে। অনেকের ধারণা, ইংরেজি

ভাষায় এক একটা বইয়ের লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয় বলেই ইংরেজ-মার্কিন লেখকরা আরাম করে, পায়ে রোদ্দুর লাগিয়ে দিনে এক পাতা দেড়-পাতা লিখে নিজেকেই ধন্য করে। এ ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলিতে আজও বড়জোর পাঁচ সাত জন লেখক জনপ্রিয় হন, বই বিক্রির গরিমায় তাঁরা সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াতে পারেন। বাকি লেখকদের অবস্থা আমাদেরই মতন। কিন্তু উন্নত দেশগুলির সরকার কিংবা সমাজ নানা ধরনের বাণিজ্য, বন্দুক নির্মাণ, অন্য রাষ্ট্রকে ল্যাং মারা ইত্যাদির মতন শিল্প-সাহিত্যের প্রসারকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন আছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, আমেরিকায় আছে তেমন বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ফাউণ্ডেশন। লেখক হিসেবে কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারলেই স্কাণ্ডি-নেভিয়ান দেশগুলিতে সংসার চালাবার চিন্তা ঘুচে যায়। সার্থক হোক বা না হোক, অনেক লেখককেই সমাজ ও সরকার ভাল কিছু লেখার চেষ্টা করার সুযোগ, সুবিধে ও পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়।

আগেকার যৌথ পরিবারে একটা ঢিলেঢালা ব্যাপার ছিল, সংসারের দুজন উপার্জন করতে বাইরে যেত, একজন জমিজমা দেখত। আর একটা ভাই বাঁশি বাজাতো কিংবা শখের যাত্রায় গান গাইত। এখন ওই বাঁশি বাজাবার কিংবা গান গাইবার লোকটিকে খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত, তাই শিল্প-সাহিত্যে দিন দিনই যেন একটা দৈন্যদশা প্রকট হচ্ছে। শুধুমাত্র জনপ্রিয়তা অর্জনের কথা চিন্তা করে কিংবা তার ওপর নির্ভর করে সৃষ্টি করতে গেলে জনরুচি কখনও উন্নত হয় না, শিল্প সৃষ্টির মধ্যে ও স্রষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না।

মনে পড়ে, একদিন কলেজ স্ট্রিটে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে তাঁর সন্ত প্রকাশিত একটি ছোট গল্পের প্রশংসা করায় তিনি আমাকে খেদের সঙ্গে বলেছিলেন, না, না, ওই সব শখের গল্প আর আমি

লিখব না। আমি এখন বিমল মিত্রের মতন উপন্যাস লিখব,
আমার পয়সা চাই। আমি মিনমিন করে বলেছিলাম, জ্যোতিদা
বিমল মিত্রের মতন লেখাও কিন্তু সহজ নয়। চেষ্টা করলেও কি
আপনি ওঁর মতন পারবেন? যে যা পারে, সে তাই লেখে।
এরপর কয়েকটি সিনেমার পত্রিকায় তিনি কয়েকটি অকিঞ্চিৎকর
ঔপন্যাসিকা লিখে আয়ুক্ষয় করলেন, সে সব লেখা কেউ মনে
রাখেনি, তাঁর টাকাও হয়নি। আজও চোখের সামনে ভাসে তাঁর
সেই ক্ষুব্ধ অভিমানী মুখ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন খ্যাতির শীর্ষে, তখনও তাঁকে
মাসের পর মাস উল্টোরথ, নব কল্লোলের পাতা ভরাতে হয়েছে,
এমন কি সংবাদপত্রের ফিচার লিখতেও বাধ্য হয়েছেন শেষ জীবনে।
চল্লিশ বছর বয়েস পূর্ণ হবার আগেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কী
সাংঘাতিক সব লেখাগুলি লিখেছেন, সেই লেখককেও অসুস্থ শরীরে
সংসার চালাবার চিন্তা করতে হয়েছে অনবরত, এ দেশের মানুষের
জন্য তিনি যে রক্ত নিঙড়ানো বইগুলি দিয়ে গেলেন, তাঁর বিনিময়ে
সমাজের কাছ থেকে কি তাঁর কিছু প্রাপ্য ছিল না? শেষ কয়েকটি
বছর কত অসমাপ্ত, অন্যমনস্ক গল্প-উপন্যাস তিনি লিখতে বাধ্য
হয়েছেন, যা তাঁর রচনা বলে প্রায় চেনাই যায় না। বুদ্ধদেব বসু
যখন 'মহাভারতের কথা' রচনা করছেন, যা সত্যিকারের একটি
মূল্যবান কাজ, যার দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করে যেতে পারলেন না তিনি,
ওই প্রবন্ধাবলী রচনার সময় শুধু সংসার চালাবার দায়ে সিনেমা
পত্রিকায় উপন্যাস লিখেছেন। সেই সময় তিনি তাঁর প্রবাসী ছোট
মেয়েকে কাতর চিঠি লিখে জানাচ্ছেন যে, তাঁর মাথায় কোনও
উপন্যাস নেই, কলম সরছে না, তবু লিখতেই হবে। সতীনাথ
ভাদুড়ী বিবাহ করেননি। পোষা কুকুর ও বাগান নিয়ে পূর্ণিয়াতে
নিজস্ব বাড়িতেই কাটিয়ে গেলেন সারা জীবন, টাকা পয়সার বিশেষ
দায় হয় তো তাঁর ছিল না। তবু, তিনি ডায়েরিতে লিখে গেছেন,

"ঢোঁড়াই চরিত মানস"-এর তৃতীয় পর্ব লেখার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু তার প্রথম দু খণ্ড মোটেই ভাল বিক্রি হয়নি এবং প্রকাশকদের কাছ থেকে বা অন্য কারও কাছ থেকে সে রকম কোনও উৎসাহ পাননি বলে আর তৃতীয় পর্ব লেখা হল না। ঢোঁড়াই চরিত মানস আমার মতে একটি অসামান্য উপন্যাস। হায়, আমাদের দেশের কী দুর্ভাগ্য, লেখকের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে উপন্যাস অসমাপ্ত রয়ে গেল!

এই সুযোগে নিজের কিছু কথা বলতেই বা ছাড়ি কেন? আমি কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলাম, পরে গল্প-উপন্যাসের জগতে অনেকখানি জড়িয়ে পড়ি। প্রথম যখন কবিতা লিখতে শুরু করি, সেই অল্প বয়সে কোনও বাধাটাই দুর্জয় মনে হয়নি, পকেটে পয়সা না থাকলেও হাস্য পরিহাস করেছি। কত সকালে খিদে দিয়ে আচমন করে শুরু করেছি কবিতা রচনার যজ্ঞ। কিন্তু কোনও উদ্বাস্তু পরিবারের সাতাশ বছর বয়সের একটি যুবকের যদি হঠাৎ পিতৃ-বিয়োগ হয়, ঘাড়ের ওপর চেপে বসে সংসার চালাবার দায়িত্ব, তা হলে হাস্য পরিহাসের বদলে তার জিভে এক সময় তেতো স্বাদ এসে যেতে বাধ্য। কবিতা লেখা মাথায় উঠল, আমি তখন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এক চতুর্ভুজ অবস্থায়। তিন খানা ছদ্মনাম সমেত নিজের নামে কত রকম গদ্য রচনাই যে লিখেছি তার ইয়ত্তা নেই। তার সবই হয়তো কাগজ ও কালির অপচয়, শুধুমাত্র একটা লেখা ছাপা হবে, কুড়ি পঁচিশ টাকা পাওয়া যাবে, এটাই ছিল একমাত্র চিন্তা। এখন অবাক লাগে ভাবতে যে স্কুল কলেজে বাংলা পরীক্ষায় আমি কোনোদিন বেশি নম্বর পাইনি, তার কারণ কোনোবারই আমি নির্দিষ্ট সময়ে সব কটা প্রশ্নের উত্তর লিখে শেষ করতে পারিনি, গদ্য সম্পর্কে আমি ছিলাম এমনই খুঁতখুঁতে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ না করে লিখতে ইচ্ছে হত না। দুটি পর্যায়ে আমি এই কলকাতার মতন শহরে পাক্কা দশ বছর বেকার জীবন কাটিয়েছি। তার মধ্যে

আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে দু'বছর বিলেতফেরত বেকার, অর্থাৎ আমার অঙ্গে বিদেশ থেকে আনা চকচকে পোশাক, কিন্তু পকেট চনচন। লেখা ছাড়া আর কোনও রোজগারের পথ জানি না, সংবাদপত্রের বিভাগীয় সম্পাদকদের মনস্তুষ্টির জন্য কত রকম বিষয়ই যে উদ্ভাবন করতে হয়েছে আমাকে। রাস্তায় পাগলা কুকুরের সমস্যা থেকে হিটলারের ছবি আঁকা পর্যন্ত! একটা চমৎকার সংস্কৃত শ্লোক আছে এই বিষয়ে। খামোখা সংস্কৃতটা আর দিচ্ছি না, শ্লোকের ভাবার্থ হল এই যে প্রাচীনকালের এক লেখক আক্ষেপ করে বলছেন, দগ্ধ উদরের স্বার্থে কত কিছুই না করতে হল এই জীবনে। এমন কি সরস্বতীকেও আমি রাস্তায় বানরীর মতন নাচিয়েছি!

সেই সব দিনে যখন কেউ আলগা ভাবে জিজ্ঞেস করত, ওহে, আজকাল তুমি কবিতা এত কম লেখো কেন? তখন ইচ্ছে করত ঠাস করে তার গালে একটা চড় মারতে।

আমার বিয়ের দিনে সকালবেলাতেও নানা লোকজনের হট্টগোলের মধ্যেও আমাকে খবরের কাগজের জন্য ফিচার লিখতে হয়েছে। রেল স্টেশনে বসে সাপ্তাহিক কলম লিখে পাঠিয়েছি বেশ কয়েকবার। বিখ্যাত মশা অধ্যুষিত দমদমের ভাড়া বাড়িতে রাত্তিরবেলা মশারির মধ্যে শুয়ে, পাশে ঘুমন্ত নবোঢ়া পত্নী, আমি এক নিরস ইংরেজি তথ্য পুস্তিকা অনুবাদ করেছি ধার শোধের জন্য, তখন আমার প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' বেরিয়ে গেছে।

আমার গ্রন্থসংখ্যা যখন একশোয় দাঁড়িয়ে যায়, তখনও আমাকে ধার করতে হয়েছে নিয়মিত। এ দেশে যে বই ছাপা হলেও টাকা পাওয়া যায় না, তা কজন জানে? দু তিন জন লেখক হয়তো কিছুটা ব্যতিক্রম, অন্যদের বই বিক্রিই বা কত। এই যে আনন্দবাজার পত্রিকাতেই প্রতি রবিবার বেস্টসেলার তালিকা বেরোয়, তাতে কোন বই সপ্তাহে বিক্রি হল কখানা তা জানানো হয় কখনও? 'টাইম' ম্যাগাজিনে যে বেস্টসেলারের তালিকা

থাকে, সেখানে মানদণ্ড হচ্ছে এই যে তালিকাভুক্ত বইগুলির প্রত্যেকটির বিক্রি সপ্তাহে অন্তত তিন হাজার কপি হতে হবে। আমাদের এখানে সপ্তাহে বোধহয় তিরিশ খানা।

'সেই সময়' উপন্যাসটি শেষ করতে আমার বছর তিনেক লেগেছিল। বইপত্র জোগাড় করতে হয়েছিল অনেক, সবগুলো কাজে না লাগলেও অপ্রয়োজনে পড়াশুনো করারও একটা আনন্দ আছে, একটা বইয়ের ফুটনোটে অন্য তিনটি বইয়ের নাম দেখে সেগুলিও সংগ্রহ করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু এই তিন বছর ধরে শুধু একটা বিষয়ের মধ্যে আপ্লুত থাকার স্বাধীনতাও যে এখন আমাদের নেই। এরই মধ্যে আমাকে লিখতে হয়েছে আরও ছোটছোট উপন্যাস ও অন্যান্য পাঁচমিশেলি রচনা 'পূর্ব-পশ্চিম' রচনার সময় আমার বার বার ইচ্ছে হয় বাংলাদেশে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আসা দরকার। ওখানকার মহাফেজখানায় কিছু কাগজপত্র দেখা বিশেষ প্রয়োজনীয়, যে-সব গ্রামের বর্ণনা আমি লিখছি সেই গ্রামের কোনও একটিতে কোনও বাড়িতে কয়েকটা রাত অন্তত কাটিয়ে আসতে পারলে কত ভাল হয়। কিন্তু সে সুযোগ কোথায়? ইতালি কিংবা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে গবেষণার প্রশ্নই ওঠে না। এত কাছাকাছি বাংলাদেশই আমাদের কাছে বেশ দুরধিগম্য। তাও আমি জোরজার করে দু একবার ঘুরে এসেছি, কিন্তু সেই হুড়ো-হুড়ির মধ্যেও বারবার সখেদে মনে হয়েছে, এ ভাবে নয়, এ ভাবে নয়। কোনও একটা জায়গায় চুপচাপ কয়েকদিন বসে থাকার মধ্যে যে অনুভবের সুখ, সেটাই যেন আমাদের কাছে এক চরম বিলাসিতা।

যদি কেউ প্রশ্ন করে কেন এখনও এত বেশি লেখেন, কে আপনাকে বছরে তিন-চারখানা উপন্যাস লেখার জন্য মাথার দিব্যি দিয়েছে? দু'তিন বছর ধরে ধীরে সুস্থে ভেবেচিন্তে বারবার কাটাকাটি করে একটা ভাল কিছু লেখার চেষ্টা করতে পারেন না? এর উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। এ কথা অবশ্য সত্যি যে

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর লেখালেখির জগতে জড়িত থাকার পর, মাত্র গত পাঁচ-সাত বছর টাকা পয়সার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েছি। এক ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা সবাই চায়, আমার আবার দেশ-বিদেশ ভ্রমণের বাতিক আছে, সে সবই এখন কুলিয়ে যায়। আমার আর বেশি কিছু চাইবার নেই, এখন আর টাকার জন্য না লিখলেও চলে। তবু লিখতে হয়। যেমন, এই যে লেখাটা আমি লিখছি, এটা তো অর্থোপার্জনের জন্য নয়। প্রাণের তাগিদেও নয়; বিভাগীয় সম্পাদক নিখিল সরকার মহাশয়ের অনুরোধে। দেশ পত্রিকা সম্পাদক সাগরময় ঘোষ কিংবা অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকরা, যাঁদের কাছে এক সময় নিজের প্রয়োজনে দুরু দুরু বক্ষে এসে একটা রচনা পেশ করেছি, আজ তাঁরা যদি নিজের থেকেই আমাকে কিছু লিখে দিতে আদেশ বা অনুরোধ করেন, তখন প্রত্যাখ্যান করি কী করে? সমস্ত পেশাতেই এটাই তো মধ্যবয়সের ট্রাজেডি। প্রথম যৌবনে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে তারপর নিজের ক্ষেত্রটিতে যখন কিছুটা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। যখন বিশ্রাম ও উপভোগের সময়, তখনই কিন্তু পরিশ্রম ও ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়। নিজের সঙ্গে সময় কাটাবার মতন সময়ই পাওয়া যায় না। যতই অনিচ্ছা থাক তবু যোগ দিতে হয় কিছু সভাসমিতিতে। এটা সেটা কমিটির মেম্বার হতে হয়, লোকজনের ভিড় লেগেই থাকে, উপরোধে অনেক আলপিন থেকে ঢেঁকি পর্যন্ত গিলতে হয়।

তবু কেউ জোর করে বলতে পারে, বাজে কথা রাখুন তো, অন্য পেশার কথা বাদ দিন, লেখা সম্পর্কে এ কথা খাটে না। আপনি লিখতে না চাইলেও জোর করে কেউ লেখাতে পারে? লোকজনের ভিড় এড়িয়ে নিরিবিলি কোনও জায়গায় গিয়ে একটা অন্তত বিষয় নিয়ে সিরিয়াসলি লিখে যেতে পারেন না?

ঠিক এইটাই আমার স্বপ্ন। পাঁচ ছ বছর ধরে ত্রিপুরার রাজবংশ ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা বড় লেখার চিন্তা আমার মাথায়

ঘুরছে, মাস ছয়েক যদি ত্রিপুরায় থাকা যায়, পড়াশুনো লেখালেখি বাদ দিয়ে শুধু দেখা আর শোনা। কিন্তু কিছুতেই তা আর হয়ে উঠছে না, ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে পরিকল্পনা। আমায় কেউ বেঁধে রাখেনি, তবু যে অতি সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল সারা শরীরে জড়ানো, তা ছাড়িয়েই বেরুনো শক্ত। আমার এই স্বপ্নের কথা যখন অন্য কারও মুখে শুনি, তখন বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়, রাগের সঙ্গে বলতে ইচ্ছে হয়, বেশ করি আমি বেশি লিখি! তোমার পড়তে ইচ্ছে না হয় পড়ো না।

মনে মনে এও জানি, অন্যান্য অনেক লেখা কমিয়ে দিয়ে, শুধু একটা লেখা নিয়েই তিন চার বছর পড়ে থাকলেই যে সেটা ভাল লেখা হবে, তারই বা কী মানে আছে? আমার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা আমার চেয়ে আর কে ভাল জানবে? আমি জীবনের প্রথম উপন্যাসটিও লিখেছি আকস্মিক আমন্ত্রণে। নিতান্ত বাস্তব প্রয়োজন কিংবা সম্পাদকীয় চাপ না থাকলে লিখতে ইচ্ছে করে না। পত্রিকা প্রকাশের ডেডলাইন যত ঘনিয়ে আসে ততই আমার কল্পনাশক্তিতে আগুন জ্বলে। এক এক দিনে কুড়ি ত্রিশ পাতা পর্যন্ত লিখে ফেলতে পারি। এর বদলে, আদর ও প্রশ্রয় পেলে হয় তো আমার গল্প লিখতে ইচ্ছেই করত না। যখন খুব দ্রুত একটা লেখা শেষ করি, বিষয়বস্তুটি মাথার মধ্যে নানা রকম উত্তেজনার সঞ্চার করে দেয়, মনে হয় যেন সম্পূর্ণ নতুন কিছু একটা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। লেখাটা শেষ হবার পর দেখি, কিছুই হল না। যা বলতে চেয়েছে, তার সিকিও ফোটেনি। কিছুদিন অপেক্ষা করে, লেখাটা ফেলে রেখে আবার পরিমার্জনা শুরু করলে কি লেখাটার উন্নতি হত। কিন্তু ম্যাজিকের মতন আবির্ভূত সেই আবেগ অন্তর্হিত হয়ে যায় হঠাৎই, সেই লেখা আর পড়তেও ইচ্ছে করে না দ্বিতীয়বার।

যে যা পারে সে তাই লেখে! এটাকেই এখন সার সত্য বলে

মানি।

বছর পনেরো আগে একজন তরুণ কবি পোস্টকার্ডে আমাকে একটা ছোট্ট চিঠি লিখেছিল, সুনীলদা, আপনি আনন্দবাজার ছেড়ে দিন, বৌদিকে ডিভোর্স করুন। আবার ফিরে আসুন আমাদের মধ্যে! প্রস্তাবটা এমনই লোভনীয় মনে হয়েছিল যে পরীক্ষা করতে উদ্যত হয়েছিলুম প্রায়। একটাই শুধু দ্বিধা ছিল, আনন্দবাজার ও স্ত্রী-পুত্র-সংসার না হয় ছাড়া গেল, কিন্তু ফিরব কোথায়? আমার তো বয়স থেমে নেই, ওদের মধ্যে আর কি ফেরা যাবে, ফিরলেও সত্যিকারের নতুন কিছু লিখতে পারব? সেই দ্বিধাটারই জয় হল শেষ পর্যন্ত, ফেরা হল না।

কিছুদিন আগে সেই তরুণ কবিটির সঙ্গে দেখা হল। সে নিজেও এখন বিবাহিত, একটি বদলির সরকারি চাকরিতে নাজেহাল, কবিতা লিখছে খুব কম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলুম, আরও পরবর্তিকালের কোনও তরুণ কি ওকেও ওই ভাষায় চিঠি লিখবে?

৪

মাইকেল মধুসূদনের দেড়শততম জন্ম-বার্ষিকীতে আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম সাগরদাঁড়িতে। মাইকেল তাঁর এপিটাফে সাগরদাঁড়ি গ্রামটির নাম বহু স্মরণীয় করে গেছেন। 'যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ তীরে'—এই পরিচয় কে না জানে।

যশোর শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে, মূল সড়ক ছেড়ে কয়েক মাইল ধুলো-ওড়ানো কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছোলাম সাগরদাঁড়িতে। সেখানে দেখলাম রীতিমতন একটা মেলা বসে গেছে। পাঁপর ভাজা, ভেঁপু, নাগরদোলা ইত্যাদি সবই আছে, দূর দূর গ্রাম থেকে মেয়ে-পুরুষরা এসেছে সেই মেলায়। তার নামই দেওয়া হয়েছে মাইকেল মেলা। একপাশে বাংলাদেশ সরকারের

উদ্যোগে এক বিশাল মঞ্চ, সেখান থেকে মাইকে অবিশ্রান্তভাবে মাইকেলের কবিতা পাঠ করে শোনানো হচ্ছে, তার এক বর্ণও সেই মেলা-দেখতে-আসা মানুষেরা বুঝতে পারছে কিনা সন্দেহ। তবু পরিবেশটা বেশ ভালো লাগে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ঠিক পরে পরেই উৎসাহ-উচ্ছ্বাস যখন বেশ প্রবল মাত্রায় ছিল, এটা সে সময়কার ঘটনা।

দত্ত কুলোদ্ভব কবির পৈতৃক ভিটা ভাঙাচুরো অবস্থায় এখনো কিছুটা টিকে আছে। একপাশে তৈরি হয়েছে নতুন গেস্ট হাউস ও লাইব্রেরি। একটা বুড়ো ধরনের জারুল গাছের (কিংবা কদম গাছও হতে পারে, ঠিক মনে পড়ছে না) গুঁড়ি চারপাশ লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে, একজন ভলান্টিয়ার বললো, মাইকেল এখানে বসে বসে কবিতা লিখতেন।

প্রতিবাদ না করে ঠোঁট টিপে হাসলুম। খুব অল্প বয়সে মাইকেল হয়তো দু'একবার এখানে এসেও থাকতে পারেন, কিন্তু কলেজে ভর্তি হবার পর যে রকম ঘূর্ণি ঝড়ের মতন তাঁর জীবন কাটে, তাতে আর জন্মস্থানে আসার কোনো সময় ছিল না। গাছতলায় বসে কবিতা লেখা আর যাকেই মানাক, মাইকেলকে কিছুতেই মানায় না। তবু বিখ্যাত লোকদের নিয়ে এরকম কিছু গুজব চলতেই থাকে। আমাদের এক বন্ধু বৃন্দাবনে বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে একজন লোক তাকে একটি লোহার দোলনা দেখিয়ে বলেছিল, এই দোলনায় রাধাকৃষ্ণ দুলতেন। বন্ধুটি উঁকি মেরে দেখে সেই লোহার রডে টাটা কোম্পানির ছাপ মারা। সে তখন সবিস্ময়ে বলেছিল, টাটা কোম্পানি যে তিন চার হাজার বছরের পুরোনো সে কথা তো জানতাম না!

অতিথি ভবনে বসে আমরা নানা রকমভাবে আপ্যায়িত হতে লাগলুম। ওখানে প্রচুর ডাব পাওয়া যায়। আমাদের জন্য গেলাসের পর গেলাস ডাবের জল আসতে লাগলো। ডাবের জল

দেখলেই আমার ইচ্ছে করে তার মধ্যে একটু জিন মিশিয়ে দিতে। তাতে অতি উপাদেয় পানীয় তৈরি হয়।

দুপুরবেলা মিটিং শুরু হয়ে গেল। বাংলাদেশের কয়েকজন মন্ত্রী ও অধ্যাপক রয়েছেন। সভাপতি মনোজ বসু। সেই সময় আমাদের কয়েকজনের ইচ্ছে হলো কপোতাক্ষ নদীটা একবার দেখে আসার। খুব কাছেই। কপোতাক্ষ নামটা শুনলেই রোমাঞ্চ হয়। নদীর এমন সুন্দর নাম কে রাখে? মাইকেল রাখেন নি। বোধ হয় আগে এই নদীর নাম ছিল কবোদাক বা এই ধরনের কোনো অনার্য শব্দ। কেউ তাকে চমৎকারভাবে বদলে দিয়েছে। নদী প্রান্তে এসে কিন্তু মনটা বড্ড দমে গেল। এ কী চেহারা নদীর! এই নদীর কথা সতত মনে পড়তো মাইকেলের? (এতক্ষণ একটা ভুল করেছি, নদী নয় তো, কপোতাক্ষ একটি নদ। কোন্ নদী নারী হবে, আর কোন্‌টা পুরুষ—এটা কোন্ প্রতিভাবান ব্যক্তি ঠিক করে দিয়ে গেছেন, আমি আজও জানতে পারি নি।) কপোতাক্ষ আসলে একটা ছোট্ট খালের মতন, জল একদম ঘোলাটে। পৃথিবীর সব নদীই আস্তে আস্তে এমন নিস্তেজ হয়ে আসছে। এক সময় এই নদী দিয়েই নাকি স্টিমার চলতো, অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য হতো। কে এখন দেখে বুঝবে সে কথা। এ যেন দান্তের বিয়েত্রিচে এখন আশি বছরের বুড়ি।

চেহারা যাই হোক, কাব্যে যে অমর হয়ে আছে, সেই নদীকে একটু উপভোগ করার লোভ আমরা সামলাতে পারলাম না। ভলান্টিয়ারদের নজর এড়িয়ে সন্তোষদা, ময়ূখ আর আমি একটা নৌকোয় চড়ে বসলুম। নৌকোর মাঝিটি অতি প্রাচীন। আমাদের নিয়ে যাবার ব্যাপারে তার তেমন উৎসাহ নেই। আমরা পয়সা দিতে প্রস্তুত, তবু সে বারবার জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন? কোথাও যাবো না। শুধু নদীর ওপরেই একটু ঘুরে বেড়াব—আমাদের এ প্রস্তাব সে বিশেষ পছন্দ করে না। অধিকাংশ মানুষই

তাদের জীবন কয়েকটি প্রয়োজনের সীমানায় বেঁধে নেয়—অপ্রয়োজনীয় কোনো কাজকেই তারা সন্দেহের চোখে দেখে। বোঝাই যায়, এ নদীতে এর আগে কেউ কখনো নৌকোয় চেপে বেড়ায় নি। আমরা মানুষ না হয়ে এক বোঝা খড় হলে বৃদ্ধ মাঝিটি খুশী হতো।

যাই হোক, আমরা উঠে যখন বসেছি, সহজে নামছি না। নৌকো চললো আস্তে আস্তে। একটু বাদেই বোঝা গেল, আমাদের তুলনায় নৌকোটি বেশ পলকা, আমরা একটু নড়াচড়া করলেই টলমল করে। এবং নদীটি চওড়ায় ছোট হলেও জল বেশী গভীর। তবু আমরা ভেসে গেলুম বেশ খানিকটা দূরে।

নৌকোর মাঝিকে জিজ্ঞেস করলুম, মিঞা ভাই, মাইকেল কে ছিলেন, আপনি তা জানেন? যাঁর নামে এই মেলা হচ্ছে?

মাঝি উত্তর দিল, খুব বড় মানুষ ছিলেন।

কিসে বড় মানুষ?

তা তো জানি না কর্তা। তবে ওনার নামে মেলা হতিছে যখন, তখন উনি বড় মানুষ ছেলেন তো বটেই!

অকাট্য যুক্তি। এ রকম সরলভাবে সব বোঝাই ভালো। আমরা আবার জিজ্ঞেস করলাম, এই মাইকেলবাবুর বাড়িতে যখন লোকজন ছিল, সেই সময়কার কথা আপনার মনে আছে?

বৃদ্ধটি স্বল্পভাষী। খুব সংক্ষেপে উত্তর দিল, এক সময় দত্তবাবুদের বাড়িতে খুব বড় দুর্গা পূজা হতো!

খানিকটা দূর ভেসে যাবার পর ওপারের সবুজ মাঠ আমাদের আকর্ষণ করে। ইচ্ছে করে ওপারে নেমে একটু ঘুরে আসতে। সে কথা আমাদের মাঝিকে বলতেই সে ঘাড় নেড়ে জানালো, না, ওপারে যাওয়া যাবে না!

আমরা অবাক। কেন, পয়সা দিয়ে নৌকো চাপছি, ওপারে নামতে পারবো না কেন? কিন্তু বৃদ্ধটি সে কথা শোনে না। সে

বলে, ওপারে নামতে হলে অনেক দূরে যেতে হবে। এখানে কাছাকাছি নামা যাবে না।

কাছেই দেখতে পাচ্ছি সবুজ ঘাসভরা মাঠ, তবু লোকটি কেন সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে চায় না, তা বোঝা গেল না কিছুতেই। বুড়োটি বড় জেদী তো! সন্তোষদার সব সময় হুকুম করার অভ্যেস, তিনি নদীবক্ষে সেই টলমল তরণীটিকে সংবাদপত্রের অফিস মনে করে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, কেন যাবে না? আমি জানতে চাই—

সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে নৌকোটি একদিকে কাৎ হয়ে পড়লো, সন্তোষদা ঝপাং করে জলে পড়ে গেলেন। এবং আমাদের দ্বিতীয়বার বিমূঢ় করে দিয়ে উনি পাকা খেলোয়াড়ের ভঙ্গিতে শুধু হাতের ভর দিয়ে চট করে উঠে এলেন নৌকোয়। তাঁর অঙ্গে কোট প্যাণ্ট ও মোজা-জুতো সমেত পরিপূর্ণ স্যুট, সমস্ত ভিজে জবজবে, সিগারেটের প্যাকেটটা ফেলে দিতে হলো, মানিব্যাগের অবস্থা করুণ।

কিন্তু আমরা সঙ্কল্প ছাড়লাম না, ওপারে যাবোই। সিক্ত অবস্থাতেই সন্তোষদা হুকুম করে যেতে লাগলেন, নৌকো ওপারের কাছাকাছি ভিড়তেই আমি ডাঙার উদ্দেশ্যে লাফ মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে কোমর পর্যন্ত গেঁথে গেলাম কাদায়। তখন বুঝলাম, কেন মাঝিটি আমাদের এ পারে নামাতে আপত্তি করছিল। কিন্তু আমাকে সেই অবস্থায় দেখে সন্তোষদা আর ময়ূখের কি হাসি! এর আগে সন্তোষদা জলে পড়ে যাবার সময় আমরা ভয়ের চোটে হাসতে পারি নি—এখন ওঁরা দুজন আমার দুর্দশা দেখে হাততালি দিচ্ছেন। আমি সাহায্যের জন্য ময়ূখের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম, তবু সে হাসি থামায় না!

ততক্ষণে নদীর ওপার থেকে ভলান্টিয়াররা আমাদের ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে, আমাদের জন্য তারা চিন্তিত। আমরা

অ্যাডভেঞ্চার সেরে কোনোমতে এ-পারে এসে পৌঁছোলাম। এদিকে মাইকে প্রধান অতিথি হিসেবে সন্তোষদার ভাষণের জন্য নাম ঘোষণা করা হচ্ছে বার বার। কিন্তু সন্তোষদার জামা-প্যাণ্ট পাল্টাবার কোনও উপায় নেই—আমাদের জামা-কাপড়ের সুটকেস রয়ে গেছে খুলনার সার্কিট হাউসে। শেষপর্যন্ত সেই পোশাকেই সন্তোষদা উঠে গেলেন মঞ্চে, সারা শরীর থেকে তখনও জল গড়াচ্ছে, শুধু পকেট থেকে চিরুনি বার করে চুলটা আঁচড়ে নিয়ে তিনি সেই অবস্থাতেই সপ্রতিভভাবে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। আমার প্যাণ্ট কাদায় প্লাস্টার করা, আমি আর সভার দিকে ঘেঁষলুমই না।

সন্ধের পর আমরা ফিরে এলাম খুলনার সার্কিট হাউসে। জামা-কাপড় বদলে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে আমরা বসলাম আড্ডায়। যোগ দিলেন আরও অনেকে। আমাদের দুপুরের নৌকো বিহার নিয়ে আবার অনেক হাসাহাসি হলো। তবে একথাও ঠিক, অনেক নদীর পাশ দিয়েই তো আমরা অনেকবার যাই, কিন্তু দুপুরের ঐ ছোট্ট ঘটনাটির জন্য কপোতাক্ষ নদের সঙ্গে আমাদের সারাজীবনের পরিচয় হয়ে গেল।

সারাদিন মাইকেলের গুরুগম্ভীর কবিতা বিষয়ে অনেক গুরু-গম্ভীরতর আলোচনা হয়েছিল, তাই রাত্রে আমরা চলে গেলাম কিছু লঘু বিষয়ে। যেমন, কথা উঠলো, মাইকেল কতখানি মদ্যপান করতে পারতেন। মাইকেলের মদ্যপান বিষয়ে বহু গল্প আছে, বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে পর্যন্ত উনি নাকি মদের বোতল চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, মদ খেয়ে খেয়ে জিভ নাকি এমন অসাড় হয়ে গিয়ে-ছিল যে স্পেনস'স হোটেলে থাকবার সময় উনি নাকি রোজ সকালে জিভে শুকনো লঙ্কা ঘষতেন। দীনবন্ধুর সধবার একাদশী নাটকের নিমচাঁদ চরিত্রটি নাকি মাইকেলের আদলে ইত্যাদি।

বাংলাদেশের এক তরুণ অধ্যাপক বললেন, উনি কোথায় যেন

পড়েছেন যে মাইকেল গেলাস ব্যবহার করতেন না, বোতল থেকে চুমুক দিয়ে খেতেন। একবার নাকি এক চুমুকে পুরো এক বোতল বী-হাইভ ব্র্যাণ্ডি (গিরিশ ঘোষও এই ব্র্যাণ্ডি খেতেন) শেষ করে ফেলেছিলেন।

অনেকেই একথা বিশ্বাস করলো না। কোনো জীবনীকার এরকম কিছু লেখেন নি। সন্তোষদা বললেন, টলস্টয়ের ওয়ার অ্যাণ্ড পীস-এ আছে একজন সৈনিক তিনতলার খোলা জানলার ওপর দাঁড়িয়ে এক বোতল রাম এক চুমুকে শেষ করেছিল। কিন্তু ওটা উপন্যাসেই হয়, বাস্তবে সম্ভব নয়।

তখন আমার মনে পড়ে গেল, তারাপদ রায় কথিত একটি রসিকতা। আমি বললাম, একবার অযোধ্যা সিং নামে একটা লোক দু চুমুকে পুরো দু বোতল রাম খেয়েছিল।

সবাই বললো, যাঃ!

আমি বললাম, হ্যাঁ, সত্যিই। একবার অযোধ্যা সিং প্রথমে এক চুমুকে এক বোতল রাম শেষ করলো। তারপর ঠোঁট মুছে বললো, এটা কী বিশ্ব রেকর্ড? তারপর সে আর এক চুমুকে আর এক বোতল রাম খেয়ে নিয়ে বললো, এটা নিশ্চয়ই চিরকালের রেকর্ড? এর পর সে মুচকি হেসে ধপাস করে পড়ে মরে গেল।

সবাই বললো, যাঃ! যত সব বাজে কথা।

আমি বললাম, মোটেই বাজে কথা নয়। কিন্তু এসব কি করে আর প্রমাণ করবো বলুন? সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও আর নেই।

৫

আমাদের পাশের বাড়িতে একজন বিখ্যাত গায়ক বেড়াতে এসেছেন শুনে আমি ছুটে গেলাম তাঁকে একটু দেখবার জন্য। গায়কটি আধুনিক, লোকসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান ইত্যাদি অনেক

রকমের গানেই সুর দেন এবং নিজে গেয়ে থাকেন এবং সব মিলিয়ে বেশ একটা প্রাণবন্ত ব্যাপার আছে। এরকম একজন মানুষকে সামনাসামনি দেখতে পাওয়া একটা সৌভাগ্যের ঘটনা।

পাশের বাড়ির বৈঠকখানায় রীতিমতন একটা ভিড় জমে গেছে! তারই মধ্যে ঠেলেঠুলে কোনোরকমে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু বাদে প্রতুলদা আমাকে দেখতে পেয়ে দয়া করে বললেন, এই নীলু, আয়, ভেতরে এসে বোস না! এমনকি প্রতুলদা গায়কটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন পর্যন্ত। যদিও আমার পরিচয় দেবার কিছুই নেই, প্রতুলদার পাশের বাড়িতে থাকি, এইমাত্র। প্রতুলদার বাংলা সিনেমা মহলে ঘোরাফেরা আছে জানতাম, সেই সূত্রেই নিশ্চয় গায়কটি এসেছেন তাঁর বাড়িতে।

তিনি বসে আছেন রাজার মতন, ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ইজিচেয়ারে। তিনি এখন মধ্যবয়স্ক। মাথার চুল একটু পাতলা হয়ে এসেছে, মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ। কিন্তু গায়ে একটা দারুণ উজ্জ্বল লাল রঙের জামা এবং তাঁর চোখের অচঞ্চল দৃষ্টি এবং দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক ঠোঁট দেখলেই বোঝা যায়, মানুষটি সাধারণ নন। বহু লোক তাঁকে ঘিরে রেখে নানা রকম প্রশ্ন করছে। তিনি খুব ভদ্রভাবে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন সংক্ষেপে।

তাঁর সামনে একটা প্লেটে কিছু মিষ্টি ও নোনতা খাবার, কিন্তু তিনি ওসব কিছুই খাবেন না। অনেক পেড়াপীড়িতেও রাজি হলেন না। তিনি শুধু এক কাপ কফি পান করবেন। তাঁর পাশেই চেয়ারে বসে আছে একটি মেয়ে। তিনি তার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, রুমি তুমি গাও না, তুমি লজ্জা করছো কেন?

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এলো। এমন রূপসী যুবতী আমি বহুদিন দেখিনি। এমন কালো, এমন সুন্দর! বাঙালী মেয়েরা সাধারণত খাঁটি কালো হয় না। অনেক মেয়েকে দেখেছি যাদের গায়ের রং ময়লা কিংবা গাঢ় শ্যামবর্ণ, কিন্তু খাঁটি

কুচকুচে কালো রঙের মেয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে চোখে পড়ে না। সে রকম হয় অরণ্যকন্যারা।

এই মেয়েটি শুধু যে কালো, তা-ই নয়, নিজের গায়ের রং আরও স্পষ্ট করবার জন্য সে পরে আছে ধপধপে সাদা শাড়ি। তার ঠোঁটে স্মিত হাসি, কোনো কথা বলতে গেলে সে আরও হাসে, তখন দেখা যায় তার ঝকঝকে দাঁতের উজ্জ্বল আলো। আর তার শরীরের গড়ন —ঠিক যেন কোনারকের মন্দির থেকে সুরসুন্দরীর মূর্তিটি তুলে এনে কেউ প্রাণবতী করেছে। মেয়েটি কিন্তু বড় লাজুক, বেশীর ভাগ সময়েই সে নতমুখী হয়ে বসে আছে। অসাধারণ সারল্য সেই মুখে, যেন সে এ পৃথিবীর কোনো অন্যায় বা পাপের কথা জানে না। সে বসে আছে আমার থেকে মাত্র তিন চার হাত দূরে, অথচ মনে হচ্ছে যেন অনেক অনেক দূরে। হে সুন্দর, এত সুদূর?

ইতিমধ্যে গায়কটির কফি পান শেষ হয়েছে, সবাই তাঁকে গান শোনাবার জন্য অনুরোধ করছে। তিনি বিনীতভাবে আপত্তি জানাচ্ছেন, কিন্তু কেউ তা কানে তুলছে না। বিখ্যাত গায়কদের এই বিপদ তো আছেই। যে-কোনো নতুন জায়গায় গেলে তাঁদের মুড ভালো থাকুক বা না থাকুক, শরীর কিংবা গলা খারাপ হোক—তবু কেউ সেই সব ওজর মানতে চাইবে না।

অগত্যা গায়কটিকে মুখ খুলতেই হলো। কিন্তু বোঝা গেল সত্যিই তিনি ক্লান্ত এবং গান গাইবার মেজাজে নেই। দু'এক লাইন গেয়েই নিজের বিখ্যাত গানগুলিরও কথা ভুলে যাচ্ছেন। তখন তিনি সেই মেয়েটিকে বললেন, রুমি, তুমিও আমার সঙ্গে ধরো তো। মেয়েটি সেই গায়কের ভুলে-যাওয়া লাইনগুলো ধরিয়ে দিতে লাগলো। কিন্তু গানটা তবু জমছে না। এক সময় গায়কটি সেই মেয়েটিকে বললেন, তুমি উঠে দাঁড়াও, ভালো করে গাও!

তিনি প্রায় জোর করিয়েই মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সেজন্য আমি তৎক্ষণাৎ গায়কটিকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম।

এবার মেয়েটিকে সম্পূর্ণভাবে দেখা গেল। সত্যিই যেন প্রাণপ্রাপ্তা সুরসুন্দরী। তার সাদা শাড়ির লাল পাড়টা চলে গেছে বুকের ওপর দিয়ে। মেয়েটির দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কোনোরকম জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই, কিন্তু মুখে মাখানো আছে একটা সহাস্য লজ্জা। সে বললো, আমি কোন্‌টা গাইবো? গায়কটি একটি গানের লাইন বললেন।

মেয়েটি গান ধরলো, খুব নীচু গলায়, প্রায় ফিসফিসিয়ে, হাত দুটো বুকের কাছে জোড় করা, তাতে আস্তে আস্তে তাল দিচ্ছে। আস্তে আস্তে গাইলেও তার সুরেলা গলায় প্রতিটি উচ্চারণ স্পষ্ট এবং যেন তার শরীরটা গানের সঙ্গে দুলছে। আমি শিউরে উঠলাম। সহ্য করতে পারা যায় না। ব্যাপারটা এমন ভালো।

গানটা একটি নদী বিষয়ে। লোকসঙ্গীতের সুর, খুব দ্রুত নয়। আমার মনে হলো বহুদূরে কোথাও কোনো পাহাড়ী উপত্যকায় বয়ে চলেছে এক নদী, সেখানে সেই বিপুল নির্জনতার মধ্যে মেয়েটি একা দাঁড়িয়ে গাইছে এই গান, তার সমস্ত শরীর ও রূপ দু-ই গানের মধ্যে নিবেদিত। মেয়েটি যেন এখানে আর নেই। আমি আবার ভাবলাম হে সুন্দর, এত সুদূর।

আমার বুকের মধ্যে রীতিমতন কষ্ট হতে লাগলো। এবং সেজন্য আমি অবাকও হয়ে গেলাম। কেন আমার কষ্ট হবে? একজন বিখ্যাত গায়কের কোনো রূপসী সঙ্গিনী বা শিষ্যা যদি একটা ভালো গান শোনায়, তাতে তো আমার খুশী হবার কথা। কষ্টের কী আছে? যখন কোনো সুন্দর ফুলের বাগান দেখি কিংবা বিখ্যাত কোনো ভাস্কর্য বা ছবি, তখন মুগ্ধ হয়ে যাই, কষ্ট তো পাই না। যারা অতি ধনী, তারা সেইসব সুন্দরকে কিনে নিয়ে বাড়ি সাজাতে চায়, আমার তেমন ইচ্ছে হয় না, আমার শুধু দেখাতেই সুখ। কিন্তু জীবন্ত সুন্দরের কথা বুঝি আলাদা। তার কাছে যেতে ইচ্ছে করে, ছুঁয়ে দেখতে সাধ হয়, অন্তত দু'একটা কথা চোখে মুখে স্বীকৃতি। আমার দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল, মেয়েটি একবার আমার চোখের সঙ্গে

চোখ মেলাক। অথচ কেনই বা সে আমার দিকে সেরকমভাবে তাকাবে? আমি কে, কেউ না। নিছক একজন পাশের বাড়ির লোক, ভিড়ের মধ্যে একজন। আমি তো জানিই, এইসব নারীদের অপর পুরুষে নিয়ে যায়। তবু মন এসব যুক্তি বোঝে না, মন কষ্ট পায়।

খানিকটা বাদে আসর ভাঙলো। গায়কটি তাঁর দলবল নিয়ে উঠে পড়লেন প্রতুলদার গাড়িতে। মেয়েটি একবারও আমার চোখে তার স্থির দৃষ্টি রাখলে না। আমি মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

বিখ্যাত লোকদের ঈর্ষা করা এক ধরনের হীনমন্যতা। ঐ গায়কটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁর প্রতিভার জন্যই, বহুলোক তাঁকে স্তুতি করে, তিনি রূপসী নারীদের কাঁধে অনায়াসে হাত রাখতে পারেন। এমন কি আমিও তো ওঁর ভক্ত। তবু সেদিন বারবার মনে হতে লাগলো, ইস, কেন আমার গলাটা এমন বেসুরো বেতাল। কেন একটু গাইবার চেষ্টা করলেই গলা দিয়ে মাটিতে টিন ঘষার মতন আওয়াজ বেরোয়? যদি গাইতে পারতাম, যদি গান শিখতাম, তবে হয়তো ভাগ্যবলে একদিন এই প্রাণবতী সুরসুন্দরীর সঙ্গে আমার সখ্যতা হতো।

কয়েকদিন মন খারাপ অবস্থাতে কাটলো। আমার অবস্থা ঠিক কোনো ব্যর্থ প্রেমিকের মতন। প্রেমে পড়া আমার রোগ। ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে ছুটে যাওয়া কোনো মোটরগাড়ির জানলায় বসে-থাকা এক নারীকে দেখেও আমি একবার এমন প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম যে তারপর সাতদিন আহারে রুচি ছিল না। বস্তুত আমার হাজার প্রেমিকাদের মধ্যে প্রায় কারুর সঙ্গেই জীবনে দ্বিতীয়বার দেখা হয় নি। আমি মনে রেখেছি, প্রতীক্ষায় থেকেছি, কিন্তু তারা ফিরে আসে নি কিংবা আমায় চিনতেই পারে নি।

সুতরাং এই জীবন্ত সুরসুন্দরীর সঙ্গে যে আমার আর দেখা হবে

না, তা ধরেই রেখেছিলাম। মন খারাপ করাটা আমার একটা গোপন বিলাসিতা। তা নিজের বাড়িতে যদি একলা একলা মন খারাপ করে শুয়ে থাকি তাতে কারুর তো কোনো ক্ষতি নেই।

তবু দেখা হয়ে গেল আর একবার। খুব অবহেলায়। খুব ভুল জায়গায়। চৌরঙ্গিতে, সন্ধ্যাকালীন ভিড়ের মধ্যে। সেই মেয়েটি আর একজন সমবয়স্কা যুবতীর সঙ্গে হেঁটে আসছিল। হাতে বেশ কিছু জিনিসপত্র। উল্টোদিক থেকে আসতে আসতে ওকে দেখেই আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠলো, আঙুলের ডগায় ও কানে গরম আঁচ টের পেলাম। মেয়েটি এবারও আমার দিকে তাকালো না। আমাকে চিনতে পারার তো কোনো কথাই নয়। আমি তো ভিড়ের মধ্যে একজন মানুষ। এক্ষুনি ও দূরে চলে যাবে, ওকে কোনোরকমে একটু থামানো যায় না? আর কোনো কারণে নয়, শুধু আর একটুক্ষণ চোখ ভরে দেখার জন্য! কিন্তু আমার যত লম্ফঝম্ফ, সবই মনে মনে। প্রকাশ্য রাস্তায় কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ করার সাহস আমার নেই। তা ছাড়া আমি ওকে ডেকে কি বলবো? আমার মধ্যে যে ব্যাকুলতাটা প্রকাশ পাচ্ছে, তার আসলে কোনো ভাষা নেই, যুক্তিও নেই।

এই সময় একটি গাড়ি এসে হঠাৎ দাঁড়ালো, তিন চারজন লোক চেঁচিয়ে ডাকলেন, রুমি, রুমি! গাড়ির দরজা খুলে নেমে এলো একজন লোক, লোকটির গায়ে সিল্কের হাওয়াই শার্ট, হাত-ঘড়িতে সোনালী ব্যাণ্ড। মেয়ে দুটি থমকে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির লোকরা তক্ষুনি ঐ রুমি নাম্নী মেয়েটিকে গাড়িতে তুলতে চায়। রুমি প্রথমে একটু একটু আপত্তি করলো। কিন্তু গাড়ির লোকরা হল্লা করছে। ফিলম, প্লে ব্যাক, রেকর্ডিং—এইরকম টুকরো টুকরো কয়েকটা কথা আমার কানে এলো। জায়গাটায় ভুরভুর করছে হুইস্কির গন্ধ।

খানিকক্ষণ টালবাহানার পর মেয়েটি রাজি হলো। তার সঙ্গিনীর হাতে জিনিসগুলো দিয়ে সে উঠে পড়লো গাড়িতে। গাড়ির

লোকগুলো একটা উল্লাসের ধ্বনি করলো। ওরা সকলেই যে মত্ত অবস্থায় আছে তা বুঝতে ভুল হয় না। এবং সোনালী রঙের ঘড়ির ব্যাণ্ড দেখলে ওরা কী ধরনের মানুষ তা-ও বোঝা যায়। উঁকি দিয়ে দেখলাম, সেই বিখ্যাত গায়কটি ঐ দলে নেই।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আমি কল্পনা করেছিলাম, কোনো এক পাহাড়ী উপত্যকায় নির্জন নদীতীরে, ঐ জীবন্ত পাথর-প্রতিমা সর্বাঙ্গ নিবেদন করে নদীর উদ্দেশে গান গায়। কিন্তু এসব নিছক রোমান্টিক কল্পনা। মেয়েটি গায়িকা হতে চায়, ওর কেরিয়ার তৈরি করতে গেলে প্লে ব্যাক, ফিলম, রেকর্ডিং—এ সবের সুযোগ নিতেই হবে। সেই প্রলোভনে নিজের বান্ধবীকে একলা ফেলে রেখেও ওকে চলে যেতে হলো কয়েকজন মাতালের সঙ্গে। এই সন্ধেবেলা কোথায় কিসের রেকর্ডিং হবে কে জানে!

এইসব নারীদের অপর পুরুষে নিয়ে যায়।

৬

গাইড! গাইড! গ্যাইড চাই স্যার? দুটি ছেলে দৌড়ে এলো আমাদের দিকে। আমরা বিরক্ত হলাম। যে-রকমভাবে আমরা ভিখারী তাড়াই, হাতের সেই ভঙ্গিতে জানালাম, না, না, যাঃ। যাঃ!

গাড়ি থেকে নামলাম আমরা চারজন। জুলাই মাসের গনগনে রোদ, অসহ্য গরম, সারা শরীরে ঘামের ঝর্না। এইসব সময় মন ভালো থাকে না।

তবু যদি যেতাম আগ্রায় কিংবা রাজস্থানে, নতুন কোনো বিস্ময় পাবার আকর্ষণ থাকতো, তা হলে না হয় শারীরিক কষ্ট বিস্মৃত হতে পারতাম। কিন্তু এসেছি মুর্শিদাবাদের কাটারার মসজিদে।

পশ্চিম বাংলা বড়ই অনৈতিহাসিক জায়গা। ভারতের অন্যত্র প্রাচীন ইতিহাসের যে সব নিদর্শন দেখে আমাদের শিহরণ জাগে,

এখানে সে রকম কিছুই নেই। এমনকি, মুর্শিদাবাদের নবাবদের রাজত্বকাল এই তো সেদিনকার ঘটনা, কিন্তু তার বিশেষ কোনো চিহ্নই নেই। শুনেছি, মুর্শিদাবাদ শহরটি নাকি এক সময় লণ্ডন শহরের চেয়েও বেশী ঐশ্বর্যময় ছিল, এখন সেসব মনে হয় গাঁজাখুরি কথা। এখানে ওখানে এক আধটা কামান আর একটা নকল প্রাসাদ ছাড়া কিইবা আছে।

তবু একজন মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর অনুরোধে তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওদিকে। ছেলেবেলায় ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের বিবরণ পড়ে তার রোমাঞ্চ জাগতো, এখন একবার স্বচক্ষে সেই জায়গা দেখতে চায়।

কাটরার মসজিদও এখন প্রায় ভগ্নস্তূপ। এই মন্দিরের চেয়ে অনেক বেশী প্রাচীন, ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ এবং এখনো অক্ষত ও সুদৃশ্য মসজিদ সারা ভারতবর্ষে আরও অন্তত দশ পনেরোটা আছে। সুতরাং এই ভগ্নস্তূপ দেখার জন্য আবার গাইড। আমাদের বিরক্ত হবারই কথা। আমরা আগে দু'তিনবার এসেছি মুর্শিদাবাদে। মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুটিকে আমরা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। পাথরের চাতাল এত তেতে আছে যে, পা রাখা যায় না। আমাদের সফর যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছে।

গাইড নামের বাচ্চা ছেলে দুটি আমাদের সঙ্গ ছাড়ে নি। আমরা ছাড়া আর কোনো ভ্রমণকারী নেই। এবং এই গরমে বিশেষ কেউ আসেও না মনে হয়। ছেলে দুটির মধ্যে একজনের বয়েস চোদ্দ পনেরো, অন্য জনের নয় দশ। কুচকুচে কালো রং, খালি গা, খালি পা। ওরা আমাদের পেছনে পেছনে আসতে আসতে অনবরত কি সব বকবক করে যাচ্ছিল।

আমরা আর একবার তাড়া দিলাম। তাতে বড় ছেলেটি নিরস্ত হয়ে একটু দূরে গিয়ে ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইলো, ছোট ছেলেটি তার কথা থামালো না।

সিগারেট ধরাবার জন্য আমরাও একটু ছায়া খুঁজে দাঁড়িয়েছি,

এই সময় সেই ছেলেটি অদূরে রৌদ্রালোকিত চাতালে ঠিক মঞ্চের ওপর একক অভিনেতার মতন হাত তুলে বললো, মনে করুন মহাশয়গণ, আপনাদের সামনে এই অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইতেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, তাঁহার দীর্ঘ দেহ, শুভ্র সস্‌, শ্মশ্রু তিনি সন্ধ্যাকালে···

বালকের রিনরিনে কণ্ঠে সেই শুদ্ধ ভাষার নাটকীয়তা আমাদের কৌতুক দেয়। আমরা চারজনেই ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুটি বেশ বাংলা বোঝে।

ছেলেটি অনবরত বলে যাচ্ছে, তাহার পর বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান অধিপতি আলিবর্দি কহিলেন, শ্বেতী রোগীদের মতন যাহাদের গাত্রবর্ণ, তাহাদের কখনো বিশ্বাস করিতে নাই! যাহারা মাথায় টুপি পরে এবং নাকী স্বরে কথা বলে, সেই ইংরাজেরা সর্প কিংবা কুম্ভীরের তুল্য। অতএব হে নাতি সিরাজ···

তত্‌ক্ষণে আমরা হোহো করে হাসতে শুরু করেছি। আমি ছেলেটিকে কাছে ডেকে এনে বললাম, এই, শোন্‌। তোকে এসব কে শিখিয়েছে ?

ছেলেটা লজ্জা পেয়ে গা মোচড়াতে লাগলো। মুখখানি সরল, টলটলে দুটো চোখ। মুখ নিচু করে বললো, শুনে শুনে শিখেছি।

কাটরার মসজিদের চেয়েও আমরা ঐ বালকটির সম্পর্কে বেশী কৌতূহলী হয়ে পড়লাম।

কিন্তু গরীবের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার বিপদ আছে। কোথা থেকে যে দংশন আসে তা বোঝা যায় না। ছেলেটি আমাদের আঘাত করলো ওর নির্লোভ সরলতায়। ও আমাদের কাছে পয়সা চেয়ে বিরক্ত করলো না, শুধু বললো, আমরা যদি চা খাই, তা হলে যেন ওর দোকানে যাই।

তোর চায়ের দোকান আছে ?

না, ওর দোকান নয়। পাশাপাশি দুটি দোকানের মধ্যে একটিতে

ও বালক-ভৃত্য। ও যদি ওদের দোকানে খদ্দের নিয়ে যেতে পারে, তাহলে মালিক খুশী হয়। চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে আমরা মালিকের সঙ্গে কথা বললাম। লোকটি দয়ালু ধরনের, তার এতই ছোট দোকান যে, কর্মচারী রাখার দরকার হয় না, তবু ছেলেটিকে রেখেছে, দু'বেলা খেতে দেয়।

আমার বন্ধু পার্থ জিজ্ঞেস করলো, এই খোকা, তোর বাড়ি কোথায় রে?

ছেলেটি ফিক করে হেসে বললো, আমার বাড়িই নেই।

চায়ের দোকানের মালিক আমাদের জানালো, ছেলেটির বাবা-মা দু'জনেই মারা গেছে। সংসারে কেউ নেই। বাড়ি ঘরও গেছে সব।

মানুষের দুঃখের গল্প শুনতে আর ভালো লাগে না। চতুর্দিকে এমন সব চলছে যে, মুখ ফিরিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঐ ছেলেটি ওর বাড়ি নেই বলে হাসলো কেন? ওর মুখখানা কাঁদো কাঁদো করা উচিত ছিল না? আমাদের কাছে দয়া চাইতে পারতো না? ন'বছরের ছেলে বাড়ি না থাকার কথা বলে হাসলে তা দেখে বুকের মধ্যে চড়াৎ করে ওঠে।

মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুটি বললো, ছেলেটি সরল এবং বেশ বুদ্ধিমান। লেখাপড়ার সুযোগ পেলে...

বরুণ বললো, কি সুন্দর ওর উচ্চারণ। শক্ত শক্ত কথাগুলো কি রকম...

পার্থর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে ওর বয়েসই সবচেয়ে কম, মনটা এখনও নরম আছে। ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, একে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যায় না?

চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে আমরা কিছুক্ষণ উতলা হয়ে উঠি। গাছের ছায়ায় সামান্য একটু শান্তি লাগে। আমরা ছেলেটির জন্য কিছু একটা করা উচিত ভেবে প্রত্যেকেই মনে মনে অল্প সময়ের জন্য

মহৎ হয়ে যাই। কেউ মুখ ফুটে কিছু বলি না। সকলেই জানি, এই মুহূর্তের সহানুভূতি সারা জীবনে ব্যাপক হবে না।

নারীর মতন কোমল ও লাবণ্যমাখা সেই বালকের মুখের দিকে আমরা মাঝে মাঝে চোরা দৃষ্টিপাত করি। ক্রমশ বিকেলের ছায়ার মতন অপরাধবোধ আমাদের মাথার চারপাশে ঘিরে আসে।

শেষপর্যন্ত আমাদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির দাম হয় দুটো টাকা

৭

কলকাতায় যখন খুব খুনোখুনি চলছে, তখন আমরা কয়েকজনে মিলে হঠাৎ ঠিক করলাম, একদিন ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দান করে আসবো। 'রক্তের বদলে রক্ত চাই' বলে একটা কথা আছে, তারই অন্যরকম একটা ব্যাখ্যা আমাদের মনে এলো। যখন মানুষের রক্ত রাস্তার ধুলো-কাদায় গড়িয়ে নষ্ট হচ্ছে, সেই সময়েই আবার বিভিন্ন হাসপাতালে অনেক দুরারোগ্য রুগী শুধু রক্তের অভাবে মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছে, এটা একটা বিশ্রী ব্যাপার না?

আমরা অনেকে মিলে একসঙ্গে ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দিয়ে আসবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল, অনেকেরই খুব জরুরী কাজ পড়ে গেছে কিংবা আটকে গেছে অন্য জায়গায়। শেষপর্যন্ত জমায়েত হলাম আমরা চারজন মাত্র। মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে আমরা আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলাম যে আমরা অন্তত দশজন যাবো, সেইজন্য ছুটির দিনেও তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন— কিন্তু মাত্র চারজনের ছোট্ট একটি দল নিয়ে যেতে আমাদের একটু লজ্জা লজ্জা লাগছিল। কিন্তু একেবারে না যাওয়ার চেয়ে চারজন যাওয়াও ভালো, এই বিশ্বাসে আমরা এগিয়ে গেলাম।

রক্ত দান সম্পর্কে অনেকের অনেক রকম আশঙ্কা বা কুসংস্কার আছে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে খুবই অকিঞ্চিৎকর। একজন স্বাভাবিক মানুষের দেহে যতটা রক্তের দরকার, থাকে তার দ্বিগুণ। সুতরাং শরীর থেকে আধ লিটার রক্ত বেরিয়ে গেলে কোনোই ক্ষতি হয় না এবং শরীরই সেটা চট করে আবার পূরণ করে নেয়। অনেক লোক নিয়মিত শরীরের রক্ত বেচে টাকা রোজগার করে। অনেক লোক শখ করেও নিয়মিত রক্ত দান করে শুনেছি। বিদেশে এমন অনেক লোক আছে, যারা বছরে তিন চারবার রক্ত দান করে, এমন কি তারা অন্য কোনো দেশে বেড়াতে গেলেও চট করে সেখানকার ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দিয়ে আসে—বিভিন্ন দেশের সার্টিফিকেট জমানো তাদের নেশা।

আমারও অবশ্য একটু একটু ভয় ছিল, তবে সেটা অন্য কারণে। খুব বেশী লাগবে কিনা। ছেলেবেলা থেকেই ইঞ্জেকশান নিতে একটু ভয় ভয় করতো। এখানে আবার কত বড় সূচ কে জানে। আমায় যখন কেউ মারধোর করার ভয় দেখিয়েছে, আমি বলেছি, ভাই যদি নিতান্ত মারতেই হয় তো গ্রীষ্মকালে মেরো, শীতকালে মেরো না। শীতকালে বড্ড লাগে।

যাই হোক, প্রথমে খাতায় নাম-টাম লিখিয়ে একটি ডেস্কের কাছে এক ব্যক্তির সামনে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, হাত দেখি।

একটা হাত বাড়িয়ে দিতেই তিনি মধ্যম আঙুলটা ধরে খানিকক্ষণ টিপেটুপে দেখলেন। তারপর একটা ফাঁকা সিরিঞ্জ প্যাট করে ঢুকিয়ে দিলেন সেই আঙুলে। বেশ লেগেছিল, আর একটু হলেই উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠতাম আর কি! আসলে কিন্তু বেশী লাগে নি, এরকম কত কেটে ছড়ে যায়, কত জায়গায় খোঁচা লাগে, তখন আমরা মোটেই তেমন ব্যথা পাই না। কিন্তু চোখের সামনে আঙুলে পিন ফোটাবার জন্যই ব্যথার বোধটা বেশী হয়। যাই হোক, সেই আঙুলের ডগা থেকে এক ফোঁটা মোটে রক্ত বেরুলো,

সেই রক্তের ফোঁটাটা ফেলা হলো সবুজ রঙের কী একটা তরল পদার্থে ভরা গেলাসের মধ্যে। রক্তের ফোঁটাটা জমাট বেঁধে ছুলতে ছুলতে সেই সবুজ জিনিসের মধ্য দিয়ে নামতে লাগলো। তাতে কী হলো, তা আমি বুঝলাম না, কিন্তু সেই লোকটি আমাকে বললেন. ঠিক আছে। অর্থাৎ আমি পাস করে গেলাম।

এবার আমাকে নিয়ে শোওয়ানো হলো একটি অয়েল ক্লথ মোড়া খাটে। সেখানে একজন আর্দালি আর একজন লেডি ডাক্তার। এ পর্যন্ত পড়ে পাঠক নিশ্চয়ই ভাববেন, এবারে আমি বানাতে শুরু করেছি। সব জায়গায় পুরুষ ডাক্তার থাকে, আর শুধু নীললোহিতের বেলাতেই লেডি ডাক্তার? কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি হলপ করে বলছি, সেদিন আমার ভাগ্য নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন ছিল, একজন লেডি ডাক্তারই উপস্থিত ছিল সেখানে। মনে হয় সন্ত পাস-করা, ফুটফুটে চেহারার একটি যুবতী, বেশ হাসিখুশী স্বভাবের। তার বাংলা উচ্চারণে একটা টান আছে, মনে হয় কোনো অবাঙালী চমৎকার বাংলা শিখেছে। আর্দালিটি প্রথমে আমার এক হাতের জামা-টামা গুটিয়ে সেখানে খুব করে কাপড়ের পট্টি জড়িয়ে বেঁধে দিলে। তারপর মহিলা ডাক্তারটি আমার করতল ধারণ করলো।

এখন অন্য কোথাও যদি আমি এরকম একটি সুন্দরী অচেনা মেয়ের করতল ধারণের চেষ্টা করতাম, তা হলে নিশ্চয়ই মার খেতাম। কিন্তু এখানে মেয়েটি অবলীলাক্রমে আমার হাত ধরলো। এবং আমরা কেউই অসুস্থ নই। সুতরাং একটু রোমাঞ্চ বোধ করলাম। মেয়েটি তারপর আমার হাতে একটা ধাতুর জিনিস দিয়ে বলল, এটা মুঠো করে ধরে রাখুন।

মাথার সামনে এনে একটা হরিণঘাটার দুধের বোতলের সাইজের বোতল রাখা হলো। তারপর আনা হলো সিরিঞ্জ। বেশ জাঁদরেল চেহারা। একটু বুক কেঁপে উঠলো।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, লাগবে?

মেয়েটি মুচকি হেসে বললো, তা তো একটু লাগবেই।

কোনো সান্ত্বনা পেলাম না। তাই অমন সুন্দরী মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও আমি মুখ ফেরালাম দেয়ালের দিকে। তারপর এক সময় অনুভব করলাম, আমার হাতে স্থচ ফোঁড়া হলো। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এবার তো মোটেই ব্যথা লাগলো না। যদিও অতবড় সিরিঞ্জ, কিন্তু ব্যথাবোধ প্রায় নেই বললেই চলে। বরং আঙুলের ডগায় পিন ফোটানোতে যেন এর চেয়ে বেশী লেগেছিল। সম্ভবত হাতটা পট্টি মুড়ে শক্ত করে বেঁধে দেবার জন্যেই ব্যথাবোধ চলে গেছে।

ভরসা করে আবার মুখ ফেরালাম। মেয়ে ডাক্তারটি আবার হেসে জিজ্ঞেস করলো, কি, খুব বেশী লেগেছে ?

আমি বললাম, মোটেই তো লাগে নি। আপনি ভয় দেখালেন কেন ?

মেয়েটি বললো, যদি বলতাম লাগবে না, তাহলে কিন্তু আপনার ঠিকই লাগতো। বেশী লাগবার ভয় পেয়েছিলেন বলেই কম লাগাটা টের পেলেন না।

রবারের নল দিয়ে আমার রক্ত গিয়ে শিশিটাতে ভর্তি হচ্ছে। আমি সেদিকে চেয়ে আছি দেখে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো আমার নাম কি, আমি কোথায় থাকি, আমি কোন কোন বই পড়তে ভালোবাসি, আমার পাহাড় ভালো লাগে, না সমুদ্র ইত্যাদি। বুঝলাম, মায়েরা যেমন ছোট ছেলেদের ওষুধ খাওয়াবার সময় নানান গল্প বলে মন ভোলায়, মেয়েটিও সেই রকম কিছু চেষ্টা করছে। অর্থাৎ ও হয়তো ভেবেছে, আমি নিজের রক্ত বেরিয়ে যাওয়া স্বচক্ষে দেখে ঘাবড়ে যেতে পারি। কিন্তু সেরকম কিছু বোধই হলো না, বরং একটু যেন আরাম লাগতে লাগলো। শরীরটা বেশ হাল্কা হয়ে যাচ্ছে।

কয়েক মিনিট বাদে রক্ত নেওয়া শেষ হলো। মেয়েটি বললো,

একটু বসে বিশ্রাম করে নিন, এক্ষুনি নামবেন না।

কিন্তু তার কোনো দরকার বোধ করলাম না। টপ করে নেমে দাঁড়ালাম। একটু মাথাও ঘুরলো না। পা-ও টললো না—অন্য বন্ধুরা তখন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, আমি বললাম, চল।

আমার এই রচনা পড়ে যদি কারুর রক্ত দান করার আগ্রহ হয়, তাহলে আমি আর একবার তাকে জানিয়ে রাখি যে, রক্ত দেবার সময় মোটেও বেশী ব্যথা লাগে না, শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না এবং সেই রক্তের জন্য পরে অন্য কারুর প্রাণ বেঁচে যেতে পারে, এই চিন্তায় বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। পৃথিবীতে যে সমস্ত সুখ বিনা পয়সায় পাওয়া যায়, এটাই বোধহয় তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আমি অবশ্য পরেও নানা কারণে কয়েকবার রক্ত দিয়েছি, ব্যাপারটা এখন আমার কাছে খুবই সাধারণ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা সব সময়েই রোমাঞ্চকর হয় এবং সেটাই বেশী মনে থাকে।

সেদিন আমরা ভলাণ্টারি ডোনার বলেই হয়তো আমাদের জন্য খাতির করে খাবার-দাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। সন্দেশ, কলা, চা, বিস্কুট ইত্যাদি। অন্যান্য খাদ্যে আমার রুচি নেই, শুধু চা বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে পড়ছিলাম, কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের রক্ত সংরক্ষণের ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দেখাতে চাইলেন। জায়গার অভাব, যন্ত্রপাতির অভাব—এসব তো আছেই, কিন্তু আন্তরিকতার খুব একটা অভাব আছে বলে মনে হয় না ওখানে। আর একটা জিনিস দেখেও মজা লাগে। রক্ত জিনিসটা ঠিক যেন দুধের মতন। গরুর দুধ সরলভাবে গরুর বাঁট থেকে মানুষের পেটে যায় না, তাই নিয়ে মাঝখানে কত কাণ্ডই না চলে। টোনড মিল্ক, স্কিমড মিল্ক—এসব ব্যাপারগুলোও ভালো করে আজও বুঝি না। আবার দুধ শুকিয়ে গুঁড়ো করে টিনে ভর্তি করাও হয়। বিদেশে দেখেছি দুধের সঙ্গে আরও প্রোটিন

ফোর্টিফায়েড করে তারপর পান করার রীতি। আমাদের গয়লারাও দেয় টিউবওয়েলের জল ফোর্টিফায়েড করা দুধ।

পরিশ্রমে রক্ত জল করা কথাটার মর্ম এতদিনে বুঝলাম। রক্তের মধ্যে বেশীর ভাগই নাকি জল। সেই জল সরিয়ে রক্তের আসল জিনিসটুকু, অর্থাৎ প্লাজমাকে আলাদা করে শুকিয়ে গুঁড়ো করা যায়। কিন্তু পাউডারের মতন সেই ব্লাড পাউডার জমা থাকে হিমঘরে। দেখে-শুনে মনে হচ্ছিল, দুধে ভেজাল দেবার মতন রক্তে ভেজাল দেবারও কোনো উপায় বেরিয়েছে কিনা কে জানে!

টাকা না নিয়ে রক্ত দান করলে পাওয়া যায় উপহার হিসেবে একটা ধাতুর তৈরি ব্যাজ বা বোতাম আর একটা কার্ড। সেই কার্ড দেখিয়ে এক বছরের মধ্যে প্রয়োজন হলে এক বোতল রক্ত পাওয়া যাবে।

সেইসব নিয়ে তো বেরিয়ে এলাম। তারপর মাসের পর মাস যায়, এর মধ্যে আমার নিজের তো দূরের কথা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কারুরই এমন কোনো অসুখ হয় না, যাতে রক্তের দরকার। আমি পরোপকার করবার জন্য মুখিয়ে আছি, অথচ তা গ্রহণ করবার কেউ নেই।

বেশ কিছুদিন পর একদিন সকালবেলা এক বন্ধু টেলিফোনে জানতে চাইলো, আমার রক্ত কোন গ্রুপের। তা তো আমার মনে নেই। কেন?

সে বললো, তাদের পাড়ার একটি মেয়ে কাল গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল, শেষ মুহূর্তে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বাঁচবে কিনা এখনো ঠিক নেই, রক্ত দিতে হবে, শুনেছিলাম তুই একবার—

সঙ্গে সঙ্গে আমি নার্ভাস হয়ে গেলাম। আমার যা এলোমেলো স্বভাব, সেই কার্ডখানা এখন খুঁজে পাবো কিনা সন্দেহ। মুহূর্তের মধ্যে টেবিল ড্রয়ার সব লণ্ডভণ্ড করে ফেললাম। এবং কার্ডটি পাওয়া

গেল এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, ব্লাড গ্রুপও মিলে গেল। বন্ধুটিকে সে কথা জানাতেই সে বললো, আমি লোক পাঠিয়ে তোর কার্ডটা আনিয়ে নিচ্ছি, তারপর যদি আরও রক্তের দরকার হয়, তোকে ডাকবো—।

আমার আর ডাক পড়ে নি অবশ্য। শুনেছি, দুদিন যমের সঙ্গে লড়াই করার পরে মেয়েটি বেঁচে গেছে, আবার সে সুস্থ জীবনে ফিরে গেছে।

কোনো বৃদ্ধ বা শিশুর জন্যও প্রয়োজন হলে আমি আমার কার্ডটা দিতাম·নিশ্চয়ই। কিন্তু যেহেতু একটি মেয়ের জন্য, তাই আমার কল্পনা নানারকম ডালপালা মেলতে থাকে।

সেই মেয়েটিকে আমি চিনি না, কখনো চোখেও দেখি নি, তবু আমার কল্পনা করতে আরাম হয় যে তার ধমনীর মধ্যে আমার রক্ত খেলা করে বেড়াচ্ছে। যদিও জানি, আমার সেই রক্ত শুকিয়ে গুঁড়ো করে করে লাগানো হয়েছে অন্য কাজে—আমার কার্ডের বদলে তারা পেয়েছে নিরপেক্ষ এক বোতল রক্ত; তবু আমার ভাবতে ভালো লাগে, যেন আমারই রক্ত কলকল করে ছুটছে তার শরীরে। এই মুহূর্তে আমি মরে গেলেও আমার সেই রক্তটুকু বেঁচে থাকবে। এই চিন্তায় আমার অতিরিক্ত সুখ হয়।

৮

ঘাটাল শহরের একটা চায়ের দোকানে বসে ছিলাম। এখান থেকে বাস ধরবো, কিন্তু একটু আগেই একটা বাস ছেড়ে গেছে, পরবর্তী বাস এক ঘণ্টা বাদে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যায় না, তাই চায়ের দোকানটাই আশ্রয়।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওরা আমাকে এক ঘণ্টাই এখানে বসে থাকতে দেবে কিনা। চায়ের দোকানে বেশীক্ষণ বসতে গেলে বেশী খেতে

হয়। কিন্তু আপাতত আমার খিদে নেই এবং ঠাণ্ডা নিমকি সিঙাড়া এবং চিনিভর্তি দানাদার খাবার ইচ্ছেও নেই। একটি ওমলেট ও চা পনেরো মিনিটেই শেষ হয়ে গেল, তারপর আর দু'বার দু কাপ চায়ের অর্ডার দিলুম।

চা কিংবা খাবার-টাবার দিয়ে যাচ্ছে একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে, বেশ ছিপছিপে চেহারা, পাঞ্জাবীদের অনুকরণে সে ডান হাতে একটি স্টিলের বালা পরেছে। ক্যাশ কাউণ্টার থেকে মালিক তাকে গোরা গোরা বলে ডাকছে। খালি কাপ তোলা কিংবা টেবিল মোছার ভার আর একটি বাচ্চা ছেলের ওপর, এর বয়েস দশ-এগারোর বেশী না। কালো তেল চকচকে মুখ দেখলেই বোঝা যায় ছেলেটি বেশ দুষ্টু। এর নাম পচা। কেন যে এমন একটা সুন্দর ছেলের নাম পচা রাখা হয়েছে কে জানে!

বহু চায়ের দোকানেই এইটুকু বয়েসের ছেলেদের কাজ করতে দেখি, কখনো আমরা আশ্চর্য হই না। শিশুশ্রমিক বিষয়ে কি যেন একটা আইন আছে শুনেছি, কিন্তু সে কথা ভেবেও লাভ নেই। সে সব আইন মানতে গেলে এইটুকু একটা ছেলেকে চাকরি দেওয়া যায় না, আর চাকরি না করলে এ ছেলেটি খেতেও পাবে না, বিশেষত বাপ মা যার নাম রেখেছে পচা।

পচা কিন্তু মোটেই মনোযোগ দিয়ে কাজ করে না। এক টেবিলে তিন-চারটে কাপ থাকলে সে কিছুতেই সেগুলো আলাদা আলাদা-ভাবে নিয়ে যাবে না। কাপগুলোকে খাড়াভাবে পর পর সাজাবে, তারপর এক হাতে দোলাতে দোলাতে নিয়ে যাবে। যেন একটা খেলা। অবশ্য পচার বয়েসী অন্য ছেলেরা ঠিক এই সময়টায় ইস্কুলের টিফিন পিরিয়ডে লুটোপুটি করে খেলা করে। অনেকক্ষণ ধরেই আমি পচাকে লক্ষ্য করছি। আর আমার একটু ভয় ভয় করছে। হঠাৎ হাত ফস্কে কাপ-টাপগুলো ভেঙে ফেলবে না তো!

শেষপর্যন্ত তা-ই হলো। আমার জন্য তৃতীয় কাপ চা নিয়ে

আসছিল গোরা। সে সব সময় দৌড়োদৌড়ি করে আসে, তার স্বভাবটাই ছটফটে। দোকানের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গোরা এদিকে যখন আসছে, সেই সময়ই পচা এক হাতে তিনটে খালি কাপ ব্যালান্স করে নিয়ে যাচ্ছিল, দুজনের ধাক্কা লাগলো। তিনটে কাপই পড়ে গেল পচার হাত থেকে, সৌভাগ্যবশত দুটো ভাঙলো না, একটা একেবারে টুকরো টুকরো।

পাছে এই ব্যাপারে গোরার কোনো দোষ ধরা হয়, তাই সে আগেই চেঁচিয়ে উঠলো, ভাঙলি তো ? কতবার বলেছি— ? তার-পরই সে এক চড় কষালো পচার গালে।

গোরার হাতের চায়ের কাপে একটুও চা চলকায়নি, সেটা সে আমার টেবিলে রেখে আবার ফিরে গিয়ে পচাকে মারতে লাগলো। দোকানের মালিক কাউন্টার থেকে স্থিরভাবে চেয়ে আছে, মুখে কোনো কথা নেই। মার খেয়েও কাঁদছে না পচা, দাঁড়িয়ে আছে গোঁজ হয়ে।

আর তিন চারজন লোক রয়েছে দোকানে। তাদের মধ্যে একজন ভালোমানুষ চেহারার লোক বললেন, ওরে হয়েছে হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর মারিস না। কাপ তো আর লোহা দিয়ে তৈরি নয়, একদিন না একদিন ভাঙবেই।

তারপর তিনি ওপরের দিকে মুখ তুলে উদাস গলায় বললেন, কোনো কিছুই চিরকাল থাকে না। মানুষের জীবনই হঠাৎ কখন চলে যায়···

মফঃস্বলের অনেক চায়ের দোকানেই এরকম এক-একজন দার্শনিক থাকে।

গোরা মার থামিয়ে ভেতরে চলে গেল। দোকানের মালিক এবার হুঙ্কার দিয়ে পচাকে বললো, সঙের মতন দাঁড়িয়ে আছিস কি ? ভাঙা টুকরোগুলো সাফ কর্। দেখবো এখন আজ খাওয়ার সময়। দুটো বাজতে না বাজতেই খাওয়ার জন্য ছোঁক ছোঁক,

এত নোলা!…

বুঝলাম, পচার কপালে আজ আরও দুঃখ আছে। দুপুরে খেতেও পাবে না বোধ হয়। এ ব্যাপারে আমার কি কিছু করণীয় আছে? দোকানের মালিককে একটা কাপের দাম দিয়ে অনুরোধ করতে পারি, ছেলেটাকে আজ উপোস করাবেন না। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ এরকম উদার সাজতে আমার লজ্জা লাগে। তাছাড়া পচার জন্য আজকে এইটুকু শুধু আমি করতে পারি। কিন্তু আগামীকাল বা তারপরের কোনোদিন পচার দুর্ভোগের ব্যাপারে কোনো সাহায্য করার সামর্থ্য আমার নেই।

পচার সঙ্গে দু'একটা কথা বলার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু সে আর এদিকে এলো না। রান্নাঘরে গিয়ে বসে আছে। কি জানি কাঁদছে কিনা। দোকান ফাঁকা হয়ে এসেছে, আমি ছাড়া আর কেউ বসে নেই। মালিকও উঠে বাইরে গেছে।

একটু বাদে গোরা এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। বোধ হয় খদ্দের খুঁজছে। কিন্তু খাঁ খাঁ রোদ্দুরে রাস্তাঘাট ফাঁকা।

গোরা আমার দিকে ফিরে বললো, বাবু বুঝি বাস ধরবেন? কোথাকার, ঝাড়গ্রামের?

ছেলেটির বুদ্ধি আছে। কিন্তু আগে থেকেই আমি ওকে অপছন্দ করে ফেলেছি। আমি একটু কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ঐটুকু ছেলেকে অত জোরে মারলে কেন?

গোরা বললো, আপনি জানেন না বাবু, ও বড় তেঁড়েটে ছেলে! না মারলে কোনো কথা শোনে না। ওর জন্য আমি মালিকের কাছে বকুনি খাই! এরকম করলে চাকরি থাকে?

আমি বললাম, ও কি তোমার ভাই-টাই হয়? মুখের মিল আছে যেন খানিকটা।

গোরা হেসে বললো, না বাবু, ভাই কি করে হবে? আমি এখানকার লোকই না।

ছেলেটা দুপুরে খেতে পাবে তো ?

কেন পাবে না ? আমাদের মালিক লোক খারাপ নয়। মুখে বকুনি দেয়, কিন্তু পেটে মারে না।

একটা টাকা দিয়ে গোরাকে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বললাম। সিগারেট নিয়ে ফিরে এসে ও বললো, আজ ঝাড়গ্রামের বাস বোধ হয় একটু লেট করবে। আগে একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। আমার বাড়িও ঝাড়গ্রামের কাছেই। আমাদের গাঁয়ের নাম বীজপোঁতা।

আমি বললাম, অত দূর থেকে তুমি এখানে চাকরি করতে এসেছো ? ওদিকে কিছু কাজ পেলে না ?

ও তল্লাটেই আমি থাকতে চাই না।

কেন ?

আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। আর কোনোদিন যাবো না।

বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে, অর্থাৎ ভাগ্যান্বেষী। হয়তো দেখা যাবে এই গোরাই একদিন বিরাট একজন শিল্পপতি কিংবা মন্ত্রী হয়ে যাবে। অন্তত এরকম একটা চায়ের দোকানের মালিক হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমার নাম কি ভাই ?

গোরাচাঁদ দলুই। পিতার নাম নিবারণচন্দ্র দলুই।

কিন্তু গোরাচাঁদ, তুমি যে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলে, তোমার বাবা-মা দুঃখ পাবেন না ?

বাবা পাবে না, মা একটু পেতে পারে। মা'র কষ্ট পাওয়াই ভালো।

কেন, তোমার মা, এমন কী দোষ করলেন, যাতে তাঁর কষ্ট পাওয়া দরকার।

মা-ই তো জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছে।

কথাটা এমন আকস্মিক যে আমার বুকে প্রায় ছুম্ করে লাগলো। আমি ছেলেটির সর্বাঙ্গে আবার চোখ বোলালাম। এবং আমতা-আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বয়েস কত ?

এই শ্রাবণে ষোলোয় পা দিয়েছি।

আরও কথায় কথায় জানা গেল যে, আমাদের এই শ্রীমান গোরাচাঁদের বিয়ে হয়েছে দেড় বছর আগে, তার বউয়ের বয়েস এখন এগারো। মা তাঁর ছেলের বউকে বড্ড বেশী ভালোবেসে ফেলেছেন, বউকে একদম বকেন না। গোরাচাঁদ বউকে অনেকবার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলেছে। কিন্তু মা রাজি হন নি।

আমি বললুম, কেন, তুমি তোমার বউকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাইতে কেন ? তুমি কি ইস্কুলে পড়তে ?

এবার আর একটি অপ্রত্যাশিত উত্তর এলো। গোরাচাঁদ রীতিমতন রাগের সঙ্গে বললো, দেবো না ? ঐ মেয়ের বাপ আমাকে বিয়ের সময় একটা সাইকেল দেবে বলেছিল, সেটা দেয় নি। ঐ মেয়ে নিয়ে কেউ ঘর করে ?

একটু দম নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বউয়ের চেয়ে সাইকেল তোমার কাছে বড় হলো ?

সে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি একটা অদ্ভুত কথা বলছি। বউ তো ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়। কিন্তু একটা সাইকেল জোটানো কি অত সহজ ?

সাইকেল নিয়ে কি করতে তুমি ?

ঝাড়গ্রামে সাতদিনব্যাপী সাইকেল প্রতিযোগিতায় নাম দিতাম।

অন্য খদ্দের এসেছে, গোরাচাঁদ তাই চলে গেল। আর কোনো খবর পাওয়া গেল না। কিন্তু এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে আমি একা একা হাসতে লাগলাম। মফঃস্বলের চায়ের দোকানে মাত্র এক ঘণ্টা বসে একটি বেশ সামাজিক চিত্র পাওয়া গেল। শিশুশ্রম,

বাল্যবিবাহ পণপ্রথা—সব কিছুই বেশ হাসি-খুশীভাবে চলছে। শুধু বীজপোঁতা গ্রামে একটি এগারো বছরের মেয়ে খুব কান্নাকাটি করছে কিনা কে জানে!

আমার মনে হলো, একটা কোনো শিকড় দরকার। যে শিকড়টা হাতের মুঠোয় এলেই আমার ইচ্ছাশক্তি এসে যাবে। সেটা নিয়ে আমি বলবো, এক্ষুনি বৃষ্টি পড়ুক, অমনি সারা দেশ জুড়ে বৃষ্টি পড়বে। আমি বলবো, দেশের সমস্ত মাঠ ফসলে ভরে যাক, প্রত্যেকটি শিশুর জন্য স্কুল, প্রত্যেকের জন্য খেলার মাঠ, গ্রাম এবং শহরের লোক ঠিক একরকম খাবার খাবে।

ছোট ছেলেরা বাথরুমে বসে যে-রকম স্বপ্ন দেখে আমি সেই রকম স্বপ্নে মশগুল হয়েছিলাম, এমন সময় গোরাচাঁদ এসে বললো, স্যার, আপনার ঝাড়গ্রামের বাস এনে গেছে।

ওঠবার সময় আমি হেসে বললাম, গোরাচাঁদ, আমি তোমাদের গ্রামে গিয়ে তোমার খবর জানিয়ে দেবো কিন্তু!

গোরাচাঁদ বিশেষ ভড়কালো না। বললো, তাড়াতাড়ি যান। এক্ষুনি বাস ছেড়ে দেবে।

বাসটায় প্রচণ্ড ভিড়। সারা গায়ে আবের মতন বাইরেও অনেক লোক ঝুলছে। তবু সেই ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো।

৯

এই ট্রামটিতে শুধু দুদিকের দেয়ালঘেঁষা লম্বা টানা সীট। গেট দিয়ে উঠেই সামনে খানিকটা জায়গা পেয়ে বসতে গেছি কণ্ডাক্টর চোখের ইশারায় নিষেধ করলেন। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি, কণ্ডাক্টর কাছে এসে বললেন, লেডিজ!

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। সম্প্রতি মিনি বাসে চড়া অনেকটা

অভ্যেস হয়ে গেছে বলে আলাদা লেডিজ সীটের কথা ভুলে যেতে বসেছিলুম। মিনি বাস বা ডি-লুক্স বাসে ছেলেরা-মেয়েরা স্বচ্ছন্দে এখনো পাশাপাশি বসে। কিন্তু যেগুলি কুড়ি পয়সার গরীবদের ট্রাম বাস, সেখানে নারীপুরুষের দ্বিজাতিতত্ত্ব এখনো অব্যাহত রয়ে গেছে।

আর তেমন জায়গা নেই তাই হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কণ্ডাক্টর ভদ্রলোক আমার উপকারই করেছেন, হঠাৎ কোনো মেয়ে এসে ভুরু কুঁচকে আমাকে উঠতে বললে আমার খুবই খারাপ লাগতো। মেয়েদের ভ্রূ-কুঞ্চন দেখলে আমি মর্মাহত হই।

ওপাশের দু'জন ভদ্রলোক একটু চেপে-চুপে বসে সহৃদয়ভাবে আমাকে বসবার জায়গা করে দিলেন। এরকমভাবে বসাটা খুবই অস্বস্তিকর, তবু নিজের চেহারাটা যত দূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে বসে পড়লাম। পরের স্টপেই তিনটি মেয়ে উঠলো।

এর পর কাহিনীটি এইভাবে এগোতে পারতো। ওদের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখে আমি চমকে উঠে বললাম, আরে, মুকুলিকা যে! মেয়েটিও চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললো, তুমি, তুমি নীলুদা না? কতদিন পর দেখা!

দুঃখের বিষয়, সেরকম কিছুই ঘটলো না। মেয়ে তিনটিকে আমি একদম চিনি না। তারা আমার দিকে একবারও চেয়ে দেখলো না। অবিলম্বে নিজেদের মধ্যে অফিস-বিষয়ক আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেল।

আমার পাশেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি আধময়লা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ট্রাম রাইটার্স বিল্ডিংস যাবে?

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

একটু পরে কণ্ডাক্টর আমার টিকিট কাটার পর সেই বুড়ো ভদ্রলোকের কাছে টিকিট চাইলেন। তিনি প্রথমে বুক পকেট,

তারপর পাশের দু পকেট তারপর আবার বুক পকেট দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে অনেক কাগজপত্র বার করে খুঁজলেন। টাকা পয়সার কোনো চিহ্ন নেই।

তখন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক গাল হেসে বললেন, যাঃ!

কণ্ডাক্টর হাত বাড়িয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। মুখে চোখে কোনো রকম কৌতূহলের চিহ্ন নেই।

বৃদ্ধ আবার বললেন, গেছে! পকেট মার হয়ে গেছে। একটাও পয়সা রাখে নি!

পকেটমারির কথাটাও অনেক দিন শুনি নি। মিনি বাস বা ডি-লুক্স বাসে পকেটমারির সুযোগ নেই। সেখানে সবাই সীটে বসে যায়, না দাঁড়ালে পকেটমাররা হাত চালাবার সুবিধে পায় না। এই ট্রামটা কিন্তু সদ্য হাওড়া থেকে ছেড়েছে, এখনো তেমন ভিড় নেই।

বাসের সমস্ত যাত্রী নীরব। আমরা এক ধরনের ব্রিটিশ ভদ্রতায় রপ্ত হয়ে গেছি। অচেনা লোকের কোনো ব্যাপারে মুখ খুলি না। অনেক যাত্রীই আড়চোখে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করছে, কিন্তু কেউ কোনো মন্তব্য করছে না।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির দাড়ি-না-কামানো মুখ, পোশাকও সম্ভ্রান্ত নয়। কেউ কেউ হয়তো ভাবছে, লোকটি ভাড়া ফাঁকি দেবার মতলব করছে। ট্রামে-বাসে তো এরকম কত রকম চরিত্রই ওঠে।

বৃদ্ধ লোকটি আবার পকেট উল্টে বললেন, সাড়ে তিনটে টাকা ছিল, কিছুই রাখে নি। তারপর কণ্ডাক্টরকে বললেন, পয়সা নেই বাবা! নেমে যাচ্ছি। হেঁটেই যাবো রাইটার্স বিল্ডিংস!

দুটি কারণে বৃদ্ধকে আমার প্রতারক মনে হলো না। প্রথম যাঃ বলে উনি হেসে উঠেছিলেন এবং ওঁর মাত্র সাড়ে তিন টাকা চুরি গেছে। এটা কোনো পাকা অভিনেতার কাজ নয়।

আমি মৃদু স্বরে কণ্ডাক্টরকে বললুম, ওঁকে বসতে বলুন, ওঁর

টিকিটটা আমি কেটে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ আবার বসে পড়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি দাদা আমার টিকিট কাটলে কেন?

এই সব ক্ষেত্রে লোকে যা করে আমিও সেইভাবে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার জন্য বললাম, ও কিছু না।

বুঝলে দাদা, ব্যাটারা বড্ড চালাক। টাকাটা বুক পকেটে না রেখে মনের ভুলে পাশ পকেটে রেখেছি, অমনি ঠিক তুলে নিয়েছে। ট্রেনেই নিয়েছে।

আপনি কোথা থেকে আসছেন?

আসছি তো চন্দননগর থেকে। রাইটার্স বিল্ডিংসে শিক্ষামন্ত্রীর হাতে একখানা দরখাস্ত দেবো—তা ফেরার ট্রেন ভাড়া, আর দুপুরে যদি কিছু খেতে হয় এই বাবদ সাড়ে তিন টাকা এনেছিলাম। হিসেব করে…

বৃদ্ধ বেশ জোরে জোরে কথা বলেন। কাছাকাছির যাত্রীরা সবাই শুনছেন। এবার আর একজন যাত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আবার চন্দননগরে ফিরবেন কি করে?

বৃদ্ধ বললেন, সে একটা কিছু হয়ে যাবে। ভগবানের যা ইচ্ছে, তাই তো হবে।

রাইটার্স বিল্ডিংসে কেউ চেনা নেই?

না। এখন আর কাউকে চিনি না। এককালে চিনতাম। এক সময় আমি জেল খেটেছি, সুভাষ বোস, গান্ধীজীর কাছে কাছে ঘুরেছি, ওঁদের ফুটফরমাস খেটেছি, এই দেখো না দাদারা, একটা দরখাস্ত নিয়ে যাচ্ছি।

উনি বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন। কয়েকজন ঝুঁকে দেখলো। কথাটা মিথ্যে নয়। বৃদ্ধটি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, সেই মর্মে একজন এম এল এ-র সার্টিফিকেটও আছে, উনি দুশো টাকা সরকারী বৃত্তিও পান, এখন ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর

জন্য কিছু সাহায্যের আবেদন করতে যাচ্ছেন। এরকম সাহায্য দেওয়া হবে বলে লোকমুখে শুনেছেন।

বৃদ্ধদের একটু বেশী কথা বলা অভ্যেস থাকে সাধারণত। উনি অনেক কথা বলতে লাগলেন। তার মধ্যেই অন্য পাশের সহযাত্রীটি একটি দু টাকার নোট বার করে খুব বিনীতভাবে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন তো এটা আপনি রাখুন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। টাকাটার দিকে চেয়ে বললেন, কেন দাদা, এটা আমাকে দিচ্ছো কেন?

ভদ্রলোক আরও নীচু গলায় বললেন, এতো কিছু না সামান্য, আপনার কাছে রাখুন, আপনারটা চুরি গেছে, ট্রেন ভাড়া লাগবে—

বৃদ্ধ বিড়বিড় করে বললেন, টাকাটা হয়তো তোমার কাজে লাগতো, আমি হাত পেতে তোমার কাছ থেকে পয়সা নেবো—বরং আমার কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত, মাথার ওপরে ভগবান আছেন যখন—

পাশের যাত্রীটি সেই দু টাকার নোটটি তাঁর বুকপকেটে গুঁজে দিলেন।

এবার লেডিজ সীট থেকে একটি মেয়ে উঠে এসে তার হাতব্যাগ খুলে একটি এক টাকার নোট নিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, দাদু এটা আপনি রাখুন।

বৃদ্ধটি এবার প্রবল আপত্তি তুললেন। না না মা, তোমার টাকা আমি কিছুতেই নেবো না। তোমার কত কাজে লাগবে, আমার এতেই হয়ে যাবে।

কিন্তু মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। সে বিনয় না করে বেশ জোর দিয়ে বললো, এটা আপনাকে নিতেই হবে। আমার দিতে ইচ্ছে করছে আপনাকে, আপনি কেন নেবেন না?

খানিকক্ষণ বাদ-প্রতিবাদ হলো, শেষপর্যন্ত বৃদ্ধটিই হেরে গেলেন। টাকাটা নিতেই হলো তাঁকে। তিনি সেটা কপালে ছুঁইয়ে বললেন,

তুমি আমার মেয়ের মতন মা, তোমার কাছ থেকে নিলে এমন কিছু দোষ নেই।

সেই মেয়েটি ফিরে গিয়ে সীটে বসার পর তার পাশের মেয়েটি ভাবলো, তারও কিছু একটা করা দরকার। অনেক মেয়ে আছে যারা নিজের থেকে কিছু করার উৎসাহ পায় না, অন্যের দেখাদেখি অনুকরণ করতে পারে। কিন্তু এ মেয়েটি তেমন সপ্রতিভ নয়, তাছাড়া বৃদ্ধটি একেবারে চ্যাঁচামেচি শুরু করে বললেন, আর একটা পয়সাও আমার দরকার নেই, আর কিছু আমি নেবো না, আর কেউ কিছু দিতে চাইলে আমি ট্রাম থেকে নেবে যাবো—।

ব্যাপারটা এখানে শেষ হলে বেশ মধুর হতো। কিন্তু বৃদ্ধ এর পরে অন্তহীন কথা শুরু করলেন। প্রথমে তো সকলকে ধন্যবাদ জানালেন প্রায় পনেরো কুড়ি বার করে। তারপর শুরু করলেন নিজের দুঃখের কাহিনী। চন্দননগরে এক ভাড়া বাড়িতে থাকেন বাড়িওয়ালা বেশী ভাড়ার লোভে তুলে দিতে চায়, বর্ষাকালে ছাদ দিয়ে জল পড়ে, ছোট ছেলেটা স্কুল ফাইনালে ফেল করেছে, টাকার অভাবে আর এক বছর পড়ানো যাচ্ছে না—গান্ধীজীর করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ডাক শুনে বেয়াল্লিশ সালে জেলে গেছি, কত কষ্ট সহ্য করেছি, এখন একটা যদি নিজের বাড়ি থাকতো—হ্যাঁ সদাশয় সরকার দুশো টাকা করে দিচ্ছেন তাতে অনেকখানি সাহায্য হয়, তবু আবার গিয়ে বলবো, আর একটু দয়া করুন। আপনারা দয়া না করলে···

আমার প্রথমে লজ্জা, তারপর অসম্ভব রাগ হতে লাগলো। এক একবার ইচ্ছে হলো, বৃদ্ধের মুখ চেপে ধরে কথা বন্ধ করে দিই। এসব কথা ওঁকে একদম মানায় না। ট্রামে অল্প বয়েসী ছেলেমেয়ে অনেক আছে, তারা ওঁর কথা শুনলে ভাববে, দেশের কাজ করতে গেলে বুঝি শেষ বয়সে এই পরিণতি হয়। না না, এসব মোটেই তাদের শোনা উচিত নয়। এই বৃদ্ধরা অল্প বয়েসে যখন দেশের

কাজে নেমেছিলেন, তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন না যে নিঃস্বার্থভাবে এই কাজ করবেন? কোনোরকম প্রতিদানের আশা করবেন না! আজকের এই দীনতা যেন সেদিনের সেই ত্যাগকে ম্লান করে দিচ্ছে।

১০

এক গ্রামে তিন জমিদার। আসলে একই জমিদারির তিন শরিক, যদিও রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় নয়। এদের মধ্যে একজন সংসার-অনভিজ্ঞ যুবা, একজন অতিসংসারী মধ্যবয়স্ক এবং আরেকজন, একটি সুন্দরী বালবিধবা। পাঠকের মনে আছে নিশ্চয়ই, এই রমেশ, বেণী ঘোষাল আর রমাকে নিয়েই শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাস। গ্রামের নাম 'কুঁয়াপুর'। এই কুঁয়াপুর গ্রামটা কোথায়?

শরৎচন্দ্রের বেশীর ভাগ উপন্যাসই বাংলার গ্রামকে কেন্দ্র করে। এছাড়া, কলকাতা, বার্মা ও ভাগলপুর তাঁর কিছু রচনায় স্থান পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের জন্ম হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে, শেষ জীবন কাটিযেছেন হাওড়া জেলার সামতাবেড়ে গ্রামে। তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে ভাগলপুরে, তার পরের অনেকখানি অংশ বর্মা মুলুকে। সাহিত্যিক খ্যাতি নিয়ে দেশে ফিরে আসার পর তাঁর বাসাবাড়ি ছিল হাওড়ার বাজে শিবপুরে। বাংলার দূর-দূরান্তের গ্রাম, অর্থাৎ যাকে বলে এঁদো পাড়াগাঁ—তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয় নি বলেই মনে হয়। তবু তিনি গ্রামের সঠিক চরিত্রটি ধরতে পেরেছিলেন।

কুঁয়াপুর নামে গ্রাম কোথাও আছে কিনা আমি জানি না। না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ তিনি এই গ্রামটির কোনো বর্ণনা দেন নি, এর থানা সদরের কোনো পরিচয় দেন নি। শুধু একটা কথা জানা যায়, এই জায়গাটা তারকেশ্বর থেকে খুব বেশী দূর নয়। কারণ, এখানেই একদিন সকালবেলা দুধপুকুরের সিঁড়িতে সিক্তবসনা রমার সঙ্গে রমেশের আবার হঠাৎ দেখা হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্রের নানান উপন্যাসে গ্রামের নামগুলো একটু অদ্ভুত। গোলাগাঁ, লালতাগাঁ, তালসোনাপুর—এই ধরনের, শুনলেই মনে হয়, যেন প্রায় বাস্তব-ঘেঁষা বানানো বানানো। লেখকরা এরকম বানিয়ে থাকেন। তবে, শরৎচন্দ্র আর একটি উপন্যাসে 'হরিপাল' গ্রামের নাম করেছিলেন, যে-নামে সত্যিই একটি বেশ প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। আর একটি উপন্যাসে একটি গ্রামের নাম পেয়েছি ভাঁড়ারহাটি। হরিপালের ঠিক উল্টো দিকেই ভাণ্ডারহাটি নামে আর একটি বেশ বড় গ্রাম আছে। এবং যে-হেতু সেই দুটি গ্রামই তারকেশ্বরের কাছে, তাই অনুমান করা যায়, তারকেশ্বরের কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে হয়তো শরৎচন্দ্রের একসময় যাতায়াত ছিল, ওখান থেকেই পেয়েছেন গ্রামের কিছু অভিজ্ঞতা।

কুঁয়াপুর গ্রামটি কোনো বাস্তব গ্রাম না হলেও চলে, কারণ এর মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে সমগ্র বাংলার পল্লী অঞ্চলের একটি ছবিই তিনি ফোটাতে চেয়েছেন। এখানে জমিদার, প্রজা, চাষী, সম্পত্তির ঝগড়া, ব্যর্থপ্রেম ছাড়াও আর একটা জিনিস রয়ে গেছে, যার নাম 'সমাজ'। সেটা অবশ্য একটা অদ্ভুত ধোঁয়াটে জিনিস।

বর্ণাশ্রম ধর্মের বিকারের যাবতীয় ফল ভোগ করছে সেই সময়কার মানুষ। যে-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কাজ ছিল শাস্ত্রালোচনা ও শুভাশুভের নির্দেশ দান—সেই ব্রাহ্মণরাই এ যুগে অশিক্ষা ও কু-সংস্কারের পঙ্কে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। তাঁদের পার্থিব সমস্ত অধিকার চলে গেলেও বিধি-নিষেধের ফতোয়া দেওয়ার অধিকারটুকু আঁকড়ে ধরে রেখেছেন প্রাণপণে। সেই জোরে, তাঁরা কুলাঙ্গার জমিদার-পুত্রের সমস্ত পাপ গঙ্গার জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে দেন, কিন্তু গরীব বিধবাকে সামান্য ত্রুটিতে বা বিনা দোষে শাস্তি পেতে হয়। এই রকম যে সমাজ, শরৎচন্দ্র তার ওপর বড্ড রেগে উঠেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই গ্রাম্য ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত কুঁদুলে, কুচুটে, গরীব, মিথ্যাবাদী এবং অকৃতজ্ঞ। এবং কথায় কথায় ছোট জাতকে

গালাগাল। 'ছোট জাতের মুখে আগুন'—এ-কথা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অহরহ পাওয়া যায়। বাংলার ব্রাহ্মণদের অপকীর্তি প্রকাশের ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন বা শাণিত কলম ধরেছেন, সুখের বিষয় ব্রাহ্মণরাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত।

সেই ব্রাহ্মণদের এখন কী দশা? উত্তর কলকাতায় একটি দোকানের নাম 'ভট্টাচার্য স্ব স্টোরস' দেখে একদিন অনেকের চোখ কপালে উঠেছিল, আজ সব কিছুই গা-সহা হয়ে গেছে। এখন কলকাতায় ব্রাহ্মণদের আলাদা করে চেনা যায় না, বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্নের ভিয়েনে কিংবা পুজো-শ্রাদ্ধে মন্ত্র পড়াবার প্রয়োজনে ছাড়া।

অনেক গ্রামেই অবশ্য আলাদা করে এখনো বামুনপাড়া বা ভট্টাচার্যপাড়া রয়ে গেছে। যেমন আছে হরিপাল গ্রামে। এরকম আরও কয়েকটি গ্রাম আমি সম্প্রতি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। প্রথম শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়লো একটা মজার ঘটনায়।

মূল রাস্তা ছেড়ে এসে একটা সরু গ্রাম্য রাস্তা। দু'পাশে যথারীতি গাছ-গাছালি ও কিছু ভাঙা বাড়ি। আসার পথে যে দু'চারটি ছেলে-ছোকরাকে দেখেছি, তারা সবাই প্যাণ্ট শার্ট পরা, ধুতি জিনিসটা গ্রাম থেকেও প্রায় উঠেই যাচ্ছে। গ্রামের মেয়েরাও অনেকদিন সেমিজ পরা ছেড়েছে, শহরের মত একই রকম সায়া ব্লাউজ ও কুঁচি দিয়ে পরা শাড়ি। এ-সব দেখে শরৎন্দ্রের কথা মনে পড়ার কথা নয়।

পথের পাশে একটা ছাগলছানা তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে। গলায় একটা দড়ি বাঁধা। সেই দড়িটা আবার বাঁধা রয়েছে মাটিতে গাঁথা একটা খুঁটিতে। রাস্তা দিয়ে যারাই যাচ্ছে, দড়িটা ডিঙিয়ে যাচ্ছে, আমরাও সে-রকমই এসেছি, হঠাৎ পেছনে শুনলাম এক বয়স্কা মহিলা একটি বাচ্চা মেয়েকে বললেন, এই শিখা, ঐ দড়িটা

ডিঙোস না। এখানে আবার ছাগলটা কে বেঁধে গেল ?

বাচ্চা মেয়েটি বললো, কেন পিসীমা, দড়ি ডিঙোলে কী হয় ?

মহিলা বললেন, কী হয় তা জানি না বাবা! শুনেছি তো শনি-মঙ্গলবার ছাগল-দড়ি ডিঙোতে নেই।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। মাথার মধ্যে টংটং শব্দ হতে লাগলো। কী যেন একটা আমার মনে পড়ার কথা। এরকম একটা কিছু যেন আমি আগে শুনেছি।

তারপর মনে পড়লো। শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাসের আরম্ভে ঠিক যেন এ-রকমই কিছু কথা আছে। তখন অবশ্য উপন্যাসের নামটা মনে পড়েনি, পরে মিলিয়ে দেখেছি, 'বামুনের মেয়ে'।

সেই উপন্যাসের আরম্ভে ছাগল দড়ি ডিঙোনো নিয়ে অনেক কথা আছে। আজও বাংলাদেশের গ্রামে সেই কথাই শোনা যায় ? কুসংস্কারের আয়ু কত বছর ? গ্রামের চেহারা বাইরের দিকে এতটা বদলে গেলেও সংস্কার বদলায় নি ?

আসলে বদলেছে। বামুনের মেয়ে উপন্যাসের দিদিমা ছিলেন উগ্রচণ্ডী, তাঁর জিভের ধার সাঙ্ঘাতিক। তাঁর নাতনীর বয়েস ন' দশ বছর হলেও, তাকে তিনি 'বামুনের ঘরের বুড়োধাড়ি মেয়ে' বলে সম্বোধন করেছিলেন। এবং তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, শনি-মঙ্গল বারে ছাগল-দড়ি ডিঙোনো খুবই একটা গর্হিত কাজ।

সেই তুলনায় এখনকার গ্রামের এই মহিলার কণ্ঠস্বর অনেক নরম এবং তিনি ঠিক নিশ্চিত জানেন না যে, দড়ি-ডিঙোলে কী পাপ হয়। কথাটা কোথায় যেন শুনেছেন, তাই মেনে চলেন। উনিও কি আমারই মতন শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়েই জেনেছেন ? কিন্তু শরৎচন্দ্রের তো উদ্দেশ্য ছিল কুসংস্কার দূর করা, তার প্রচার বৃদ্ধি তো নয়! তারপরই আমার ঝোঁক চাপলো গ্রামের এখনকার অবস্থার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বর্ণনা যতদূর সম্ভব মিলিয়ে দেখতে।

সেই গ্রামে একজনের সঙ্গে আমার আগে থেকে চেনা ছিল।

তাঁকে খুঁজে বার করলাম। গ্রামের পথে অচেনা লোকের গোয়েন্দাগিরি আজকাল কেউ সুনজরে দেখে না। তাই কোনো চেনা লোকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ানো আমার পক্ষে সুবিধেজনক।

আমার চেনা ব্যক্তিটি নিজে ব্রাহ্মণ, থাকেন বামুনপাড়ায়, কিছুদূরের একটি কলেজে ফিজিক্যাল ইনসট্রাকটর। অর্থাৎ মোটামুটি শিক্ষকতার ধারাটি বজায় রেখেছেন।

তাঁর কাছে গাঁয়ের ব্রাহ্মণদের কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, শুনুন, একটু আগে একটা মজার ব্যাপার দেখেছি। একটু আগে যখন বৃষ্টি পড়ছিল, আমি শুয়েছিলাম খাটে, জানলা দিয়ে পুকুরের ওপারটা দেখা যায়। বৃষ্টি শুরু হতেই পুকুরের ওপাশে একটা বাড়ির উঠোনে একজন মাঝবয়েসী লোক ছুটে এলো। মহাব্যস্ত হয়ে প্রায় নাচানাচি করতে লাগলো। উঠোনে শুকোচ্ছিল কিছু ঘুঁটে। পাখির মা তার বাচ্চাদের সামলাবার জন্য যে রকম ছটফট করে, সেই লোকটিও প্রায় সেই রকমভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঘুঁটেগুলোর ওপরে, যাতে বৃষ্টিতে না ভেজে! বুঝলেন?

সত্যিকথা বলতে কী, গল্পটার মধ্যে খুব একটা মজা আমি খুঁজে পেলাম না।

আমার চোখের ভাব দেখেই ভদ্রলোক বুঝলেন। তিনি বললেন, জিনিসটা আপনার কাছে পরিষ্কার হলো না তো? এই জানলা দিয়ে দেখুন। আমাদের পাড়াটা বামুনপাড়া। আর পুকুরে ঐ ধারে হচ্ছে বিদ্যালঙ্কার পাড়া। এক হিসেবে ওরা আমাদের চেয়েও উঁচু, কারণ ওখানে শুধু বিদ্যার চর্চা হতো, অনেক বড় বড় পণ্ডিত জন্মেছে ও পাড়ায়। আজ তার অবস্থা দেখুন। যে লোকটির কথা বললাম, এখনো তার পদবী বিদ্যালঙ্কার, কিন্তু সে ঘুঁটে বিক্রি করে। এবং সে নিরক্ষর।

ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য নতুন কিছু নয়। তার পেশা বদলও এখন অনেকটা জানা হয়ে গেছে। বাজারে যারা মাংস বিক্রি করে, তাদের মধ্যেও যে কেউ ব্রাহ্মণ নেই, এমন কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি না। কিন্তু ব্রাহ্মণ তার থেকেও বেশী হারিয়েছে তার ফতোয়া দেবার অধিকার। যে-কোনো অপরাধেই, কারুকে প্রায়শ্চিত্ত করাবার বা কারুর ধোপা-নাপিত বন্ধ করে একঘরে করবার অধিকার আর ব্রাহ্মণের নেই। রেল স্টেশনে নেমেই গ্রামের পথে দুটি ডায়িং ক্লিনিং ও সেলুন দেখে এসেছি। তারা খদ্দেরের জাত জিজ্ঞেস করে না নিশ্চিত। শরৎচন্দ্রের বর্ণনা থেকে এখনকার অবস্থা এই দিক থেকে অন্তত অনেক বদলে গেছে। অবশ্য এমন অনেক গ্রাম এখনো আছে, যেখানে সেলুন-ডায়িং ক্লিনিং নেই, এমনকি ব্রাহ্মণও নেই। আসলে জমিদারী প্রথা বন্ধ হবার পর আমাদের গ্রাম্য-কাঠামোয় যে বিরাট বদল এসেছে, তা আমরা এখনো সবটা বুঝতে পারি না। জমিদারের বদলে জোতদার বলে নতুন একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে কয়েক বছর, কিন্তু সেই জোতদারদের কথা সাহিত্যে ঠিক মতন ফোটে নি এখনো। ওদিকে কয়েক শো বছরের জমিদারির গাঢ় ছবি দেগে গেছে সাহিত্যে। অত্যাচারী জমিদারদের যেমন পেয়েছি, তেমনি অনেক আদর্শবাদী কিংবা ট্র্যাজিক নায়কও এসেছে জমিদার শ্রেণী থেকে।

জমিদার শ্রেণীর অনেক পরগাছা ছিল। বস্তুত গ্রাম্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ছিল কোনো-না-কোনোভাবে জমিদারদেরই আশ্রিত। জমিদারীর ভগ্নদশার ফলে তাদেরও দিন শেষ হয়ে গেছে।

অধিকাংশ জমিদারের পদবীই রায় বা চৌধুরীই হতো। পরিচিত ভদ্রলোক এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে গেলাম রায়পাড়া দেখতে। সন্ধে হয়ে এসেছে, ঝুপঝুপ করে নামছে অন্ধকার, একদিকে ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ শোনা গেলেও দূরে কোথাও তারস্বরে বাজছে মাইক।

রায় পাড়ার মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। পাশাপাশি কয়েকটা বিশাল বাড়ি। কারুকার্য করা সিংহদ্বার। উঁচু উঁচু খিলান দেওয়া মস্ত ঠাকুর দালান। সামনে প্রশস্ত বাঁধানো প্রাঙ্গণ। সেখানে ঘাস গজিয়েছে। সব গৃহই শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। হৃতশ্রী, ভগ্নমনোরথ জমিদাররা শহরে পলাতক। এখন তাদের খাজাঞ্চিখানায় শিয়াল ঢোকে, অন্দর-মহলে বসে সমাজবিরোধীদের জুয়ার আসর।

পরিত্যক্ত অট্টালিকার একটা অন্যরকম রূপ আছে। সেই অন্ধকার চত্বরে দাঁড়িয়ে আমার গা একটু ছমছম করে ওঠে।

যে-সব প্রাক্তন জমিদাররা শহরে পালিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে দু-চারজন কেউকেটা হয়েছে বটে, বাকিরা ভিড়ে হারিয়ে গেছে। তারা কেউ কেরানী বা ঠিকেদার এমন কি শেয়ার বাজারের দালাল হলেই বা তাদের কে চিনছে। বাধ্য হয়েই জমিদার বংশের যে-সব উত্তরাধিকারীকে গ্রামে থেকে যেতে হয়েছে, তাদের অবস্থা সত্যিই করুণ। এককালের অনেক রাজপুরী এখন প্রায় পোড়ো বাড়ি, তারই দু-একটি ঘরে তাদের বাস। তাদের চেহারায় এখনো কিছুটা আভিজাত্যের ছাপ, কিন্তু তাদের বাড়ির বৌ-ঝিরা পুকুর পাড় থেকে চুপি চুপি কলমি শাক তুলে নিয়ে যায় রান্নাঘরে। জমিদারদের শেষ দশা শরৎচন্দ্র দেখে যান নি। তাদের বর্ণাঢ্য সূর্যাস্ত পর্ব নিয়ে তারাশঙ্কর কিছু লিখে গেছেন, তাদের এখনকার আঁধার-পর্ব কোনো সাহিত্যিকের লেখনীর অপেক্ষায় আছে।

জমিদারপাড়া ছেড়ে কুমোরপাড়ার পাশ দিয়ে আসছিলাম বাজারের দিকে। বিশাল বটগাছের নিচে ঝুপসি অন্ধকার, এ জায়গাটা শ্মশান, না সান্ধ্য আড্ডাখানা? চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডা এখন গ্রাম থেকে উঠে গেছে, চাকুরিজীবী যুবকরা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, বেশী রাত্রে ফিরে আর আড্ডার সময় পায় না, কিন্তু বুড়োদের গুলতানি এবং পরনিন্দা-পরচর্চার একটা জায়গা থাকবে না? বট-

গাছের তলায় একটা বাঁধানো বেদী দেখে সেই সন্দেহ দূর হয়।

রাস্তার ওপরে কয়েক হাত অন্তর অন্তর জল-কাদা। মাঝে মাঝে বড় বড় গাড্ডা। পথপ্রদর্শক খুব বিবেচনার সঙ্গে টর্চ দেখাচ্ছেন, যাতে আমরা হুমড়ি খেয়ে না পড়ি। গ্রামের রাস্তায় জল-কাদা থাকবে না, এ আবার একটা কথা নাকি? তাও তো এখন শীত, বর্ষাকাল নয়।

'পল্লী সমাজ'-এর এক জায়গায় শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "গ্রামের যে পথটা বরাবর স্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহার একটা জায়গা আট দশ বৎসর পূর্বে বৃষ্টির জলস্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি ভাঙনটা ক্রমাগত দীর্ঘতর এবং গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে।··· কোনো বছর বা দুটা বাঁশ ফেলিয়া দিয়া, কোনো বছর বা একটা ভাঙা তালের ডোঙা উপুড় করিয়া দিয়া, কোনোমতে তাহার সাহায্যে ইহারা আছাড় খাইয়া, হাত-পা ভাঙিয়া, ওপারে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু এত দুঃখ সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা আজ পর্যন্ত তাহার সংস্কারের চেষ্টা মাত্র করে নাই।" রমেশ চেষ্টা করেছিল চাঁদা তুলে রাস্তাটা সারাতে। কিন্তু কেউ এক পয়সা চাঁদা দেয় নি, সকলে বলেছে, রমেশের গরজই বেশী, সে জুতো পায়ে মশমশিয়ে হাঁটতে চায় কিনা।

প্রায় সেই রকমই একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি মুচকি হাসতে লাগলাম। এই অংশটিতে অন্তত শরৎচন্দ্রের রচনা কালজয়ী। পঞ্চাশ ষাট বছরেও অবস্থা একই রকম। গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে কোথাও রাস্তা সারাবে, এটা অকল্পনীয়। কেনই বা সারাবে? শহরের লোকেরাই কি নিজেরা উদ্যোগী হয়ে রাস্তা সারায়?

তবে, পাণ্ডুয়া স্টেশনে নেমে পার্বতীর শ্বশুরবাড়ি হাতিপোতায় গরুর গাড়ি করে পৌঁছোতে দেবদাসের টানা দু'দিন লেগেছিল। এখন পাণ্ডুয়া স্টেশন তো দূরের কথা, পশ্চিম বাংলায় যে-কোনো

রেল স্টেশন থেকেই যে-কোনো গ্রামে যেতে গরুর গাড়িতে চেপেও দু'দিন লাগতে পারে না। সেই তুলনায় রাস্তা অনেক বেশী তৈরি হয়েছে, অধিকাংশ গ্রামের পাশ দিয়েই বাস চলে। পাণ্ডুয়া থেকে বাসে চেপে এখন যে-কোনো দেবদাস ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে হাতি-পোতায় পৌঁছে যেতে পারে।

শরৎচন্দ্র গ্রামের সমস্যাগুলি বেশ স্পষ্টভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন। যদিও তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে একটি কুমারী মেয়ের কী করে বা কার সঙ্গে বিয়ে হবে, সেটাই প্রধান সমস্যা, তবু এর পাশাপাশি চলেছে অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদের বিষ, অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং এক শ্রেণীর দ্বারা আর এক শ্রেণীকে শোষণ।

জাতিভেদের ব্যাপারটা প্রকট করার জন্য তিনি এতদূর গেছেন যে নায়ক-নায়িকা দুজনেই বামুন হওয়া সত্ত্বেও কে বড় বামুন কে ছোট বামুন সেই বিচার করে। ভালোবাসা মিথ্যে হয়ে গেছে। 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের নায়িকা সন্ধ্যা অরুণকে প্রত্যাখ্যান করেছে এই বলে যে, 'আমি তো ভুলতে পারিনে, আমি কত বড় বামুনের মেয়ে।'

অরুণ হতবুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর আমি?'

সন্ধ্যা বললো 'তুমিও আমার স্বজাত,—কিন্তু তবুও বাঘ আর বেড়াল ত এক নয় অরুণদা?'

কল্লোল যুগের লেখকদের আমল থেকে দেখা যাচ্ছে জাতের অমিল সত্ত্বেও নায়ক-নায়িকা দুজনেই বিয়েতে আগ্রহী, কিন্তু যত বাধার সৃষ্টি করেছে তাদের বাবা-মায়েরা। শরৎচন্দ্রের সময় পর্যন্ত, নায়ক-নায়িকারাই এই সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি, তাদের মধ্যে অন্তত একজন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরা, মনে করেছে, এটা পাপ। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অক্লান্ত চেষ্টা এবং আইনের সাহায্য থাকা সত্ত্বেও শরৎ সাহিত্যের কোনো বাল-বিধবা আবার বিয়ের কথা স্বপ্নেও ভাবে নি, প্রেমের উন্মেষেও তারা অপরাধিনী বোধ

করেছে।

'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের অরুণ আবার বিলেত-ফেরত। সেজন্য সে তো আরও ম্লেচ্ছ, তাকে পেতলের ঘটিতে জল খেতে দেওয়া হয়। এখনকার কোনো বিলেত-ফেরত অবশ্য গ্রামে গিয়ে স্থায়ী হয় না। যদিবা ক্বচিৎ তারা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়, হীরের টুকরো ছেলে হিসেবে তারা সকলের আদর পায় এবং ঘরে ঘরে গিয়ে চা-সন্দেশ খায়।

জাতিভেদ আর ছোঁওয়া-ছুঁয়ি গ্রামদেশে কতটা কমেছে, তা দু একদিন গ্রামে ঘুরলে বোঝা যায় না, তবে, ছুলে বাগ্‌দীর ছোঁয়া লাগলে আশা করি এখন আর কেউ এমনকি কোনো কট্টর বামুনও শীতের সন্ধেবেলায় স্নান করে না মনে হয়। ট্রেনে কিংবা বাসে এই ছোঁয়া বাঁচাবার তো কোনো উপায়ই নেই। তবু, জাতির পাঁতি আর ছুঁৎমার্গ যে এখনো ভিতরে ভিতরে বহুদূর শিকড় চালিয়ে রয়ে গেছে, সে-সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। একটি গ্রামে, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে আমরা কয়েকজন একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম। বন্ধুর মায়ের চেহারা অবিকল মা-মা ধরনের। শুভ্র পরিচ্ছন্ন বসনে তাঁকে মহিমাময়ী মনে হয়েছিল। বন্ধুর দেখাদেখি আমিও তাঁর মাকে প্রণাম করলাম। তিনি একেবারে আঁতকে উঠলেন। ওঁরা কায়স্থ আর আমি জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ। সুতরাং ব্রাহ্মণ হয়ে আমি ওঁর পায়ে হাত দিয়ে নাকি ওঁকে মহাপাতকী করেছি। তিনি উল্টে আমার পায়ে হাত দিতে আসতেই আমি চোঁ-চা দৌড় মেরে পালালুম।

শরৎচন্দ্র একজায়গায় লিখেছেন, 'জগদ্ধাত্রীর মেয়েটাকে নাকি তার বাপ লেখাপড়া শিখুচ্ছে? তারা করচে কি? মানা করে দে—মানা করে দে,—মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে যে একেবারে গোল্লায় যাবে।'

শরৎচন্দ্রের গ্রাম্য নায়িকারা ইস্কুলে যায় না, বাড়িতে থেকে

কোনোমতে চিঠি লেখার মত বিদ্যে (বেশ সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন) আয়ত্ত করে। তাতেই এই আপত্তি। এই অবস্থা এখন অনেক বদলেছে। এখন গ্রামের উচ্চবর্ণের মেয়েরা স্কুলে পড়তে যায়—তাতে কোনো সামাজিক আপত্তি নেই। এমনকি, বিস্ময়ের কথা, অনেক স্কুলই কো-এডুকেশনাল, অর্থাৎ ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। আলাদা করে বালিকা বিদ্যালয় যেখানে খোলা সম্ভব হয় নি, সেখানেই এই ব্যবস্থা। বেশ দূর দূর গ্রামে আমি এমন শিক্ষাব্যবস্থা দেখেছি, কোনো সমাজপতি সেখানে আপত্তি তোলেন না। বরং, কলকাতায়, বা কোনো শহরেই এখনো কো-এডুকেশনাল স্কুল নেই।

গ্রামে গ্রামে ঘুরলে একটা কথাই বার বার মনে হয়, আমাদের আগেকার সাহিত্যে যে ছবি ফুটেছে, সেরকম খাঁটি গ্রাম এখন আর কোথাও নেই। শরৎচন্দ্রের কোনো গ্রামে বিদ্যুৎ কিংবা যন্ত্র ছিল না। এখন গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার শুভ উদ্যম দেখা দিয়েছে। যে-সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছবে, সেখানেই পৌঁছবে মাইক্রোফোন। যে-কোনো উৎসবেই সেখানে তারস্বরে হিন্দী গান বাজে। কোনো একটি অঞ্চলের সব উৎসবে আগাগোড়া অন্য একটি ভাষার সঙ্গীত নিয়ে আমোদ করা হয়—এ রকম উদাহরণ পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে তো মনে হয় না।

গ্রামগুলি দেখলে মনে হয়, সবই যেন পরিবর্ধিত শহরতলি। পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে জীবনযাপনে শহরেরই অনুকরণ এখন। গ্রামের মধ্যে এরকমভাবে শহর ঢুকে গেলেও শহর থেকে কিন্তু এখনো গ্রাম সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নি। গ্রাম মানে ব্যবহারের গ্রাম্যতা। কলকাতার মতন বড় শহরেও গ্রাম্যতার উদাহরণ ভূরি ভূরি। কিন্তু সে তো অন্য গল্প।

বউবাজারের কাছে এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। গল্প করতে করতে দুজনে মন্থরভাবে হাঁটতে লাগলাম। দুপাশে অনেক মিষ্টির দোকান। বউবাজার পাড়ার মিষ্টি সুবিখ্যাত। একটা দোকানের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কচুরি ভাজার গন্ধ নাকে এলো। বন্ধুটির দিকে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, দোকানটাতে ঢুকে পড়লে কেমন হয়; অনেকদিন কচুরি খাইনি।

বন্ধুটি আঁতকে উঠে বললো, তোর মাথা খারাপ? এগুলো তো একদম বিষ! এই সব কচুরি-সিঙাড়া-তেলেভাজা এসব মানুষে জেনেশুনে খায়?

আমি ছেলেবেলা থেকে এসব অনেক খেয়েছি। তখন তো বিষ খাচ্ছি বলে টের পাইনি।

বন্ধুটি অনেকদিন বিদেশে ছিল। আধুনিক খাদ্যপ্রণালী সম্পর্কে তার বেশ স্পষ্ট মতামত আছে বোঝা গেল। সে বললো, এই ছাখ, এতগুলো মিষ্টির দোকান—অনেক ইয়ংম্যান সেগুলোয় বসে বসে খাচ্ছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে যুবকদের এরকম মিষ্টি খাওয়ার দৃশ্য কল্পনাই করা যায় না। সেই জন্যই আমাদের দেশের ছেলে ছোকরাদের স্বাস্থ্য এত খারাপ, সেই জন্যই অলিম্পিক থেকে অপমানিত হয়ে খালি হাতে আমাদের দেশ ফিরে আসে।

অলিম্পিকের কথা শুনে একটু মন খারাপ হয়ে যায়। মুখ নীচু করে থাকি।

বন্ধুটি বললো, এই যে দ্যাখ, রাস্তায় বসে বেগুনি-ফুলুরি ভাজছে ভেজাল তেল, রাস্তার ধুলো, পোকায় কাটা বেগুন—এইগুলোই তো লোকে খাবে। সামান্যতম খাদ্যমূল্য নেই এগুলোর, শুধু পেট ভরে আর লিভার খারাপ হয়।

আমি বললাম, কিন্তু স্বাদ বেশ ভালো। মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না।

বন্ধুটি রেগে গিয়ে বললো, দূর দূর। এই ভালো লাগাটা হচ্ছে ডায়াবিটিসের রুগীর রসগোল্লা খাওয়ার লোভ কিংবা থ্রোট ক্যানসারের রুগীর লুকিয়ে সিগারেট খাওয়ার মতনই। উঠতি বয়সের ছেলেরা যখন এগুলো খায়, আমার কষ্ট হয়। এর বদলে যদি এরকম ছোট ছোট দোকানে মাংস ভাজা বিক্রি হতো—সেই খেয়ে ছেলেগুলোর স্বাস্থ্য ভালো হতে পারতো।

কিন্তু মাংসের যে অনেক দাম! সাধারণ লোকে কি খেতে পারে?

বাজে কথা বলিস না। মাংসের মোটেই বেশী দাম নয়। বেশী দাম হচ্ছে আমাদের সংস্কারের। যে কোনো খেলার মাঠের বাইরে কী দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়? ঝালমুড়ি, ফুচকা, আলু-কাবলিওয়ালারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা দারুণ পরিশ্রম করে ক্ষুধার্ত ছেলেরা বাইরে এসে এগুলোই খায়। এর কোনোটার খাদ্যমূল্য নেই, বরং হজমশক্তিটা জখম করে দেয়। এইসব ছেলেদের আমরা অলিম্পিকে পাঠাবো? এর বদলে এক-টুকরো সেদ্ধ গরুর মাংস আর দু পীস পাঁউরুটিতে কত দাম পড়ে? একখণ্ড মাংস লার্ডে ভেজে নিলে স্বাদ আরও বাড়ে।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। বিদেশফেরত বন্ধুটিকে এ ব্যাপার সহজে বোঝানো যাবে না। এ নিয়ে ঢের তর্কবিতর্ক আন্দোলন হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত এই, গো-মাংস এ দেশে সামাজিক-ভাবে গ্রহণীয় হবে না। কয়েকটি রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ করে আইন হয়ে গেছে। অন্য রাজ্যগুলিরও ঝোঁক সেই দিকে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই গরুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এবং গরুর এমন অযত্নও আর কোনো দেশে হয় না। রোগা, হাড় বার করা, করুণ চেহারা। গো-মড়ক যখন-তখন লাগে। যত গরুর গাড়ি, তার প্রত্যেকটি

গরুর কাঁধে ঘা। তবু গরু এ দেশের একটি পবিত্র প্রাণী। মাতার সমান। অনেক জাতেরই এরকম দু' একটা হিপক্রিসি থাকে।

বন্ধুটি তবু আবেগের সঙ্গে বলে চলেছে, কলেজ জীবনে আমরা কলাবাগানে গিয়ে তিন আনায় এক প্লেট বীফ কারি আর এক আনায় দুটো হাতে গড়া রুটি দিয়ে চমৎকার টিফিন করতাম। এখনো অনেক মুসলমানের দোকানে দশ পয়সার একটা শিক কাবাব পাওয়া যায়। দুটো শিক কাবাব আর একটা রুটি তিরিশ পয়সা— তবু তুই বলবি প্রোটিন খেতে বেশী পয়সা লাগে?

আমি বললাম, বক্তৃতা দিয়ে তো লাভ নেই। মানুষের সংস্কার সহজে কাটানো যায় না। জোর করেও কাটানো যায় না।

বেশ তো, গরু না হয় পবিত্র প্রাণী, কিন্তু মোষ? মোষ তো আর পবিত্র নয়! আমাদের দেশে এই কিছুদিন আগেও দুর্গাপুজায় মোষ বলি দেওয়া হতো, মোষের মাংস কেন বাজারে বিক্রি হয় না? পাঁঠা, মুর্গীর চেয়ে তা নিশ্চয়ই সস্তা হতো। শুনেছি কলকাতার হোটেল রেঁস্তোরায় মাটন কারি বলে যা বিক্রি হয়, তার মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগই মোষের মাংস। আমরা চপ কাটলেটে মোষের মাংস ভেজাল দিতে পারি, কিন্তু বাজার থেকে সেই মাংস বাড়িতে কিনে এনে খেতে পারি না! শুয়োরও পবিত্র নয়। শুয়োরের মাংস খেতেই বা কি দোষ? শুয়োরের বাচ্চাগুলো পিলপিল করে বাড়ে—একটু যত্ন করে সাদা শুয়োরের চাষ করলে সারা দেশে অঢেল শুয়োরের মাংস পাওয়া যেতে পারতো।

এ দেশের অধিকাংশ লোকই এখনো কোনো রকম মাছ মাংসই খায় না! এটা অহিংসার দেশ।

এ দেশে বেশী লোক কেন নিরামিষাশী, সেটাও আশ্চর্যের ব্যাপার। আর্যরা ছিল ঘোরতর মাংসভোজী। তাদের বংশধর হয়ে আস্তে আস্তে আমরা কি করে নিরামিষাশী হয়ে গেলাম? পৃথিবীতে আর কোনো দেশে একরকম নিরামিষ বাতিক নেই। শুধু

ভারতীয়রাই কেন এরকম ? অহিংসা ? এ দেশে মারামারি কাটাকটি অন্য কোনো দেশের থেকে কম হয় ? গৌতম বুদ্ধও মৃত্যুর আগে শুয়োরের মাংস খেয়েছিলেন।

ঐ ব্যাপারটা নিয়ে মতভেদ আছে শুনেছি। যে শ্লোকটা থেকে ঐ ঘটনা জানা যায়, সেই শ্লোকের নাকি অন্য রকম অর্থও হয়।

সে যাই হোক। কিন্তু অহিংসার প্রচারক সম্রাট অশোকও জীবহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন নি। অশোকের একটি ইনস্ক্রিপশনে আছে, যতদূর সম্ভব কম জীবহত্যা করবে। এমনকি রাজবাড়ির রন্ধনশালাতেও সপ্তাহে দু দিনের বেশী ময়ূরের মাংস রান্না করার দরকার নেই। তার মানে, অশোক অন্তত দুদিন মাংস খেতেন, কিংবা দুদিন ময়ূরের মাংস, অন্যদিন অন্য মাংস।

কথায় কথা অনেক দূর গড়ালো। অলিম্পিকে ভারতের লাস্ট হওয়ায় সে খুবই মর্মাহত হয়েছে। বারবার বলতে লাগলো, উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়েদের তেলেভাজা, ঘিয়েভাজা আর সন্দেশ-রসগোল্লা না খাইয়ে যে মাংস খাওয়ানো উচিত, এটা অনেকেই এখনো বোঝে না। বিশেষত যারা খেলাধুলো করে, তাদের রোজ মাংস না খাওয়ানো পাপ ? নিশ্চয় পাপ।

বন্ধুটি বাসে উঠে গেল। আমার পর পর আর কয়েকটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ট্রেনে একবার একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, বয়েস তেইশ-চব্বিশ, উত্তরবঙ্গে কোথায় যেন একটা চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে যাচ্ছে। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে বেশ সময় কাটছিল। কৃষ্ণনগর স্টেশনে একটা বাচ্চা বাদামওয়ালার কাছ থেকে আমি চার আনার বাদাম কিনতে গেলাম, সে আমাকে গছিয়ে দিল আট আনার। অত বাদাম দিয়ে আর আমি কী করবো! সহযাত্রী ছেলেটিকে বললাম, তুমিও নাও ভাই।

ছেলেটি প্রত্যাখ্যান করলো।

আমি বললাম লজ্জা পাচ্ছ নাকি ? আরে নাও, নাও!

ছেলেটি মুখ বিকৃত করে বললো, নাঃ! চিনেবাদাম খেলে বড্ড অম্বল হয়।

আমি স্তম্ভিত। চিনেবাদামের খাদ্যপ্রাণের কথাই শুনেছি, অম্বলের কথা আগে কক্ষনো শুনি নি। আর এই ছেলেটির মাত্র বাইশ-তেইশ বছর বয়েস, এখনই অম্বলের ভয়? বাকি জীবনটা তা হলে কি ভাবে কাটাবে?

সেবারই ট্রেনে রাত্রে খাবার জন্য চিকেনকারি রাইস অর্ডার দিয়েছি। নিয়ে এলো রেলের বিরাট থালা ভর্তি ভাত আর সামান্য দু টুকরো মুর্গী। ঝোলটা লাল টকটকে, ওপরে সর্ষের তেল ভাসছে—অর্থাৎ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর তেল দিয়ে জিনিসটার খাদ্যগুণ অনেকখানি নষ্ট করা হয়েছে, মাংসের টুকরো দুটিও দারুণ শক্ত। যাই হোক, আমি খানসামাকে বললাম, একঠো বর্তন হ্যায়? হিঁয়াসে ভাত উঠা লিজিয়ে। লোকটি জানালো, না, তার কাছে বর্তন নেই, হুজুর যেন সবটাই খেয়ে নেন। আমি বললাম, হাম তো রাক্ষস নেহি হ্যায় যে, ইতনা ভাত খায়েগা! শুধু শুধু নষ্ট করেগা কাঁহে? লোকটি কোনো উত্তর না দিয়ে চলে গেল। সেই বিস্বাদ মুর্গীর ঝোল দিয়ে আমি সেই ভাতের এক-চতুর্থাংশও শেষ করতে পারলাম না। বাকি ভাত সত্যিই নষ্ট হলো এবং এই অপচয়ের জন্য আমার গা কচকচ করতে লাগলো। ভারতের সর্বত্রই ট্রেনে যে পরিমাণ ভাত বা রুটি দেয়, ততটা কোনো ভদ্রসন্তানের প্রয়োজন হয় না। সেই অনুপাতে মাছ বা মাংস বা তরকারি যৎসামান্য। অবশ্য আমি দেখলাম, আমার সঙ্গের ছেলেটি একটুকরো মাছের ঝোল দিয়েই পুরো ভাত সাবড়ে দিয়েছে! আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম।

আর একবার ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় কয়েকটি ছেলের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। সেবার আমি রাত্রে খাবার অর্ডার দিতে যেতেই ছেলে তিনটি বললো, না না, আপনি আমাদের

সঙ্গে খাবেন। আমাদের সঙ্গে বাড়ি থেকে তৈরি করা খাবার আছে, অনেক আছে, আপনাকে আমাদের সঙ্গে খেতেই হবে। ছেলে তিনটির আন্তরিকতায় রাজি হতেই হলো।

যথা সময়ে ওরা টিফিন ক্যারিয়ার খুললো। তার মধ্যে ঠেসে ভর্তি করা লুচি ও শুকনো আলুর তরকারি। আমাকে ওরা জোর করে খানদশেক লুচি ও অনেকটা তরকারি দিয়ে দিল। দশখানা লুচি আমি জীবনে একসঙ্গে খাই নি। তা ছাড়া ঠাণ্ডা লুচি ও আলুর তরকারি মোটেই আমার প্রিয় খাদ্য নয়। কয়েকটা লুচি ওদের ফিরিয়ে নিতে বললাম, ওরা কিছুতেই নেবে না, ভাবছে, আমি লজ্জা পাচ্ছি। ওরা দেখলো, ওদের প্রত্যেকের ভাগেই দশখানা করে পড়েছে। সেই লুচি আর আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না। একটু একটু করে ছিঁড়ে মুখে দিই আর জল খাই। কোনো রকমে গোটা তিনেক খেলাম, তারপর ওদের অলক্ষ্যে এক একখানা ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম জানলা দিয়ে। ওরা কিন্তু পরম পরিতৃপ্তিতে সবকটা শেষ করলো। ওরা বাইরের কেনা জিনিস খায় না। বাড়ির তৈরি খাঁটি জিনিস খায়। ওরা কিংবা ওদের বাড়ির লোক জানেই না, ঐ খাদ্যে খাদ্যমূল্য প্রায় কিছুই নেই। ট্রেনে মাছ-মাংস নিয়ে আসার অসুবিধে আছে। কিন্তু গোটা ছয়েক ডিম সেদ্ধ আনার কোনো অসুবিধে ছিল না। দেখে বোঝা যায় ওদের পারিবারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল। রাত্রে শোওয়ার সময় যখন জামা খুললো, দেখলাম, ওদের প্রত্যেকের গলায় মাতুলি। এই আমাদের দেশের যুবসমাজ। অথচ কী সরল, সুন্দর ওদের মুখ।

ট্রেন থেকে দেখা আর একটি দৃশ্য। কয়েকজন সাঁওতাল একটা মরা শুয়োর বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জায়গাটা জঙ্গল মতন, ওরা কোনো বুনো শুয়োর শিকার করেছে কিনা জানি না, অথবা নিজেদের শুয়োরই ঝলসাতে নিয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। তখন মনে পড়লো, সাঁওতালদের মেঠো ইঁদুরও পুড়িয়ে খেতে দেখেছি।

অনেকদিন আগে, ঘাটশীলায় দুর্গা পুজোয় পাঁঠা বলির সময় সাঁওতালরা এসে দাঁড়িয়ে থাকতো—বলির পরে মাটিতে জমে থাকা থকথকে রক্ত তুলে নিয়ে যেত ওরা। শুনেছিলাম, ওরা নাকি জমাট রক্ত ভাজা করে খায়। রক্ত আবার কি করে ভাজে তা আমি বুঝে উঠতে পারি নি। কিন্তু পরে অনেকবার দেখেছি, খাদ্যের ব্যাপারে ওদের কোনো বাছ-বিচার নেই। এবং সাধারণভাবে সাঁওতাল পুরুষদের স্বাস্থ্য খুবই মজবুত। নাগাল্যাণ্ডে নাগারা শুনেছি একটা ফড়িং ধরলেও ডানা দুটো ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে—অর্থাৎ কোনো রকম প্রোটিন তারা নষ্ট করে না। এদের স্বাস্থ্যও ঈর্ষণীয়। সাঁওতাল বা নাগা বা অন্যান্য আদিবাসীদের কেউ কখনো অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য তৈরি করার কথা ভেবেছে? আমেরিকায় নিগ্রোরা যতই অবহেলিত হোক, খেলার জগতে তাদের প্রাধান্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না। অলিম্পিকে আমি যতদূর জানি, তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতাও আছে। সেখানে আমাদের কোনো সাঁওতাল বা নাগা তীরন্দাজদের কখনো পাঠিয়ে দেখার কথা আমরা চিন্তাও করি না।

এইসব এলোমেলো চিন্তাগুলিই লিখে ফেলছিলাম, এমন সময় আর এক বন্ধু এসে বললো, কী লিখছিস দেখি? পাতাগুলো তুলে চোখ বুলোতে বুলোতে বললো, তোর মাথায় আবার এসব ঢুকলো কেন? টুকরো টুকরো গল্প লিখিস, সে-ই তো ভালো। অলিম্পিকে ভারত হেরেছে, তাতে এমন কি দোষের হয়েছে? বরং সেটাই আমাদের গৌরব। অলিম্পিকে এবার যে-সব ছোট ছোট দেশ অনেকগুলো প্রাইজ পেয়েছে তারা খেলাধুলো ছাড়া আর কিছু জানে? সে-সব দেশের কোনো বড় লেখক, কবি বা শিল্পীর কেউ নাম শুনেছে আজকাল? অলিম্পিকে কবিতা লেখার কোনো প্রতিযোগিতা নেই। যদি থাকতো, দেখত, ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালীদের সঙ্গে কেউ পারতো না। ঐ এক ব্যাপারে বাঙালীরা চ্যাম্পিয়ান!

১২

টিকিট কেটে গ্যালিফ স্ট্রীটের ব্রিজের কাছে স্টীমারে চেপে বসলুম। মাত্র তিন মাস কলকাতার বাইরে ছিলুম, এর মধ্যে কলকাতার বদল হয়ে গেছে, চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না।

স্টীমার মারহাট্টা ডিচ ধরে চললো পুব দিকে। টলটল করছে জল, আগাগোড়া দু'পাশ বাঁধানো, পাড়ের এখানে ওখানে দু'একটা গাছের নিচে ফরাসী কায়দার চায়ের দোকান। স্টীমার চলছে রাজহংসীর মতন অহংকারের সঙ্গে। জলে আরও অনেক নীল-হলুদ-লাল রঙের নৌকো, সেগুলোও মানুষে ভরতি, শুনলাম ওরাও অফিসযাত্রী। কী করে এমন বদল হলো? অথচ, কয়েক দিন আগেও দেখে গেছি—এই মারহাট্টার খাল কী নোংরা, কুৎসিত, আশেপাশের লোকের সাধারণ বাথরুম ছিল এটা, দু'চারটে খড়ের গাদা নৌকো ছাড়া আর কিছু দেখিনি। হঠাৎ কি করে ম্যাজিকে বদলে গেল সব?

ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা এ স্টীমারটা কদ্দূর পর্যন্ত যাবে? আমি তো কিছু না জেনেই টিকিট কেটে উঠে পড়লুম।

ভদ্রলোক অবাক গোল চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর বললেন, বাঙাল নাকি আপনি? কলকাতার খবর কিছুই রাখেন না? এ স্টীমার এদিক দিয়ে একেবারে নারকোলডাঙা দিয়ে চলে যাবে শেয়ালদার পেছন পর্যন্ত। আর উল্টোদিকে যেটা যাচ্ছে, সেটা বাগবাজার দিয়ে গঙ্গায় পড়ে বাঁ দিকে বেঁকে থামবে ডালহাউসির কাছে। অফিসে যাচ্ছি এখন মহা আরামে। দেখবেন না, এরপর কলকাতার সঙ্গে লোকে ভেনিসের তুলনা করবে।

আমি একটু কাঁচুমাচু হয়ে বললুম, দেখুন, আমি বাঙাল ঠিকই। অনেক খবর রাখি না। এই রকম একটা চমৎকার কাণ্ড কি করে এই কদিনের মধ্যেই হয়ে গেল বলুন তো ?

লোকটি রহস্যময়ভাবে হেসে বললো, দৈবে তো বিশ্বাস করেন না ? এখনো দৈবে অনেক কিছু ঘটে। এই নতুন পরিকল্পনাটা হঠাৎ একসঙ্গে কয়েকজনের মাথায় খেলে যায়, আর তারপর তাদের মতেরও মিল হয়ে গেল—সেটা দৈব নয় ? মুখ্যমন্ত্রী, স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী, মেয়র, সি এম পি ও'র কর্তারা, কংগ্রেসের নেতা এমন কি বিরোধী দলগুলোর নেতারাও একসঙ্গে মিটিং-এ বসে পরিকল্পনাটা দিয়ে ফেললেন একমত হয়ে। তারপর বিনা পয়সায় কাজ হয়ে গেল।

বিনা পয়সায় ? চক্র রেল, ভূগর্ভ রেল নিয়ে এত নয়-ছয় চলছে, আর স্টীমার পথ হয়ে গেল বিনা পয়সায় ?

হ্যাঁ মশাই ! বিরোধী দলগুলো যেমন ধর্মঘটের ডাক দেয়, সেই-রকমই একদিন ডাক দিলো ধর্মকর্মের। গত ২-রা আর ৩-রা জুলাই সমস্ত দলের নেতাদের ডাকে রাইটারস বিলডিং থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সরকারি আর বে-সরকারি অফিসের কর্মচারীরা আর কলেজ-ইউনিভারসিটি-মেডিক্যাল-এর ছাত্রছাত্রীরা অফিসে বা কলেজে না গিয়ে, আর ময়দানেও না গিয়ে সোজা চলে এসেছিল এই খালপড়ে। তারপর কাজে লেগে গেল—করপোরেশান সাপ্লাই দিয়েছিল খন্তা কোদাল আর ঝুড়ি। ব্যস, লাখ পাঁচেক লোক হাত লাগালে—এইটুকু কাজ আর কতক্ষণ লাগে মশাই ! দু' দিনের এতবড় খালটা মেরামত হয়ে গেল, পোরট কমিশনের লোকেরা ড্রেজার দিয়ে চড়া পরিষ্কার করে দিয়েছে, সাত দিনের মধ্যে লাইসেন্স ইস্যু—এখন দেখছেন তো কি সুন্দর নৌকো আর স্টীমার চলছে। শুনছি, দক্ষিণ কলকাতাতেও এরকম একটা কাটা হবে।

আমি বললুম, চমৎকার ! এত ভালো লাগছে ! অফিসে

যাওয়ার সুবিধে ছাড়াও শহরের পাশ দিয়ে স্টীমারে চড়ে বেড়াবার এমন সুযোগ।

ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, আপনি বিয়ে করেছেন?

আজ্ঞে না, এখনও, মানে—

শুনুন, আপনাকে তা হলে একটা টিপস দিই। শহরের কর্তারা তরুণ-তরুণীদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য রোমান্স করারও বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। এই স্টীমারের ছাদের ওপর যে সুন্দর সীটগুলো আছে, সন্ধে ছ'টার পর ওখানে সাধারণ যাত্রীদের প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায়। শুধু একজন তরুণ আর একজন তরুণী—এইরকম জোড় বেঁধে এলে—বিবাহিত হোক বা না হোক—সেইসব কাপ্‌লদের জন্যই ওপরের টিকিট দেওয়া হয় তখন।

ওপরে তখন টিকিটের দাম বেশী নাকি?

না, সাধারণ দিনে, প্রতি টিকিট ৫০ পয়সা। কিন্তু ঠিক পূর্ণিমা আর অমাবস্যার দিন দাম বেশী—ঐ দিন বেশী ভিড় হয়তো—ঐ দু' দিন প্রতি টিকিট এক টাকা। চলুন, ঘণ্টা দিয়েছে, শিয়ালদা পৌঁছে গেছি।

অবশ্য, এই রচনাটির নাম হওয়া উচিত 'যদি'। বাগবাজারের নোংরা খালপাড়ে দাঁড়িয়ে আমি এই স্বপ্নটা দেখলাম।

১৩

ছেলেবেলা থেকেই সব কিছু অবিশ্বাস করতে শিখেছিলাম। দ্বিজেন জ্যাঠামশাই'র বাড়ির বারান্দায় লণ্ঠন জ্বেলে আমরা কয়েকজন গল্প শুনতাম ওঁর কাছে। হঠাৎ বাইরে কি রকম অস্বাভাবিক শব্দ হতে আমরা সবাই ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে জ্যাঠা-মশাই'র সামনে এসে বসতাম। দ্বিজেন জ্যাঠা গম্ভীর হয়ে বলতেন, যা দেখে আয় তো ওটা কিসের শব্দ। কে যাবে—আমাদের কারুর

সাহস নেই, কিন্তু জ্যাঠামশাই জোর করে একজন না একজনকে পাঠিয়ে দিতেন। হয়তো সেণ্টু ফিরে এসে মুখ চুন করে বলতো, কিছু তো দেখলুম না। জ্যাঠামশাই চোখ বুজে গড়গড়া টানতে টানতে বলতেন সে কি আর এতক্ষণ থাকে।

কে? সে? আমরা একেবারে শিউরে উঠতুম।

কারণ ছাড়া কার্য হয় না। চোখে দেখতে না পেলেও কিসে কি হচ্ছে বুঝে নিতে হয়। আমাদের বাড়ির চাল থেকে তোদের বাড়ির রান্নাঘরের চালে লাফিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল মদনমোহন, পারে নি ঠিক মতো, ফস্‌কে গিয়ে অতিকষ্টে রান্নাঘরের চাঁচের দেয়ালটা ধরে ফর্‌ফর্‌ করে নেমেছে—আর দেয়ালের গায়ে ঝোলানো ছিল রুটি সেঁকার চাটুটা—সেটা পড়ে গিয়ে ওরকম শব্দ হল।

মদনমোহন জ্যাঠামশাই'র আদরের হুলো বেড়ালটার নাম। ঘর থেকে এক পা-ও না বেরিয়ে ওরকম ছবির মতো ঘটনাটা কি করে বললেন—ভেবে আমরা অবাক হয়ে যেতুম। কিন্তু বিশ্বাস করতুম জ্যাঠামশাইকে। ঐরকমভাবেই আমরা ভূত-প্রেত অবিশ্বাস করতে শিখেছিলুম।

সন্ধেবেলা এক-একদিন আড়িয়াল খাঁ নদীর পাড়ে বেড়াতে যেতুম। ফেরার সময় ঘুটঘুটে অন্ধকারে আদিগন্ত পাট ক্ষেতের পাশ দিয়ে আসতে আসতে দূরের একটা সাদা মতন পদার্থ দেখিয়ে জ্যাঠামশায় বলতেন, ঐ দ্যাখ পেত্নী দাঁড়িয়ে আছে। মাছ খেতে আসে রোজ।

জ্যাঠামশাই যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই ওটা পেত্নী নয়। কারণ জ্যাঠামশাই বলেছেন যে, ভূত-পেত্নী বলে কিছু নেই। সুতরাং তাঁর কথার মর্যাদা রাখতেই আমরা তাঁর একথার প্রতিবাদ করতুম। তবে ওটা কি এখান থেকে বল তো? তিনি জিজ্ঞেস করতেন। তখন আরম্ভ হতো আমাদের অনুমানের খেলা। কেউ বলতো কলাগাছ,

কেউ বেলগাছ, কেউ বলতো—ওখানে একগোছা পাট শুকিয়ে ইন্দ্র-পুজোর জন্য ধ্বজা করে গেছে। আমি বলেছিলুম: ধোপাদের বউ ওখানে দাঁড়িয়ে হারানো গাধাটাকে খুঁজছে। জ্যাঠামশাই বলে-ছিলেন, আমারটাই ঠিক। আমরা আর কেউ মিলিয়ে দেখতে যাইনি। অন্য গল্প করতে করতে বাড়ি চলে গেছি।

এইভাবেই—যে-কোনো কাজের পিছনে যুক্তি খোঁজার বদ অভ্যেস আমার দাঁড়িয়ে গেছে। এখন মনে হয়, সত্যিসত্যিই হয়তো অনেক ভূত-প্রেত অলৌকিক রহস্যকে যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু কোনো একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পাবার আজকাল খুব ইচ্ছে হয়। আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও খুব ভালো, কিন্তু ইচ্ছে হয় অকারণে চশমাটশমা নিয়ে চোখ-ছুটো একটু খারাপ করে ফেলি। তবু যদি কখনও কোনো সত্যিকারের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। এসব চেনা জিনিস দেখতে দেখতে একঘেয়ে হয়ে গেছে। এখন আমি যুক্তি ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

মনে পড়ে, শ্যামপুকুরের বাড়িতে যখন থাকতুম, নিচের তলাটা ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা, শুধু একটা ঘরে শুতুম আমি, বাড়ির আর সবাই দোতলায়। ঐ বাড়িতে ভূতের ভয় ছিল শুনেছি। আমাদের আগের ভাড়াটেদের বড় মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল ও বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে। কতজন তাকে দেখেছে। ছাদের ওপর চুল এলো করে বসে কাঁদতো—কেউ দেখতে পেলেই এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেত। আমি কতবার চেষ্টা করেছি তার দেখা পাবার। একদিন মাঝ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। জানলার ওপর টক্‌টক্ আওয়াজ শুনলুম।

ঘুমের ঘোর কাটার আগে শব্দটা কোথা থেকে আসছে কিছুই বুঝতে পারিনি। আমার পাতলা ঘুম, চট্ করে ভেঙে যায়। বুঝতে পারলুম, শব্দ হচ্ছে আমার পায়ের কাছের জানলার পাল্লায়। অল্প অল্প জ্যোৎস্নায় অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি জানলার বাইরেটা—সেখানে কোনো মানুষের মুখ নেই। কিন্তু শব্দটা হাওয়ার নয়,

স্পষ্টত মানুষের, নির্দিষ্টভাবে একটু থেমে শব্দ হচ্ছে ঠক্ ঠক্ ঠক্।

আমার বালিশের তলায়, বেড সুইচ। তা ছাড়া ইঁদুরের উৎপাতের জন্য পাশে একটা মোটা বেতের লাঠি রেখে দিতাম। সুতরাং সশস্ত্র ছিলাম। তবু আলো জ্বালিনি, শুরু করেছি যুক্তির খেলা। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমারই কোনো বন্ধু-বান্ধব ডাকতে এসেছে। দীপকের ফ্ল্যাটবাড়ির সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে মাঝে মাঝে রাত্রে এসে ও আমার সঙ্গে শুতো। কিন্তু দীপক তো চুপ করে থেকে জানলা নক্ করার ছেলে নয়। এতক্ষণে ওর কম্বুকণ্ঠে সারা পাড়া নিনাদিত হয়ে উঠতো। তবে কি কোনো চোর? আমি জেগে আছি কিনা দেখার জন্য আওয়াজ করছে? আমি খর চোখে তাকিয়ে রইলুম—জানলার পাল্লায় আবার আওয়াজ হল ঠক্ ঠক্ ঠক্। কিন্তু কোনো মানুষের হাত বা মুখ দেখা গেল না। অথচ জানলাতেই যে শব্দটা করা হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। জানলার কপাট-দুটো ঘরের মধ্যে ঢোকানো—সুতরাং কেউ আওয়াজ করলে তার হাত-দুটো আমি দেখতে পাবোই। এমন মূর্খ আমি—কোনো অদৃশ্য বা অলৌকিক অস্তিত্বের কথা তখন আমার মাথাতেই আসে নি। আমার পক্ষে সবচেয়ে সহজ ছিল—আলো জ্বেলে উঠে গিয়ে দেখা। কিন্তু ঐ যে—অনুমান এবং ডিডাকশান করার লোভ। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে নানান্ যুক্তি ভাবতে লাগলুম। শেষপর্যন্ত পেয়ে গেলাম সমাধান। টিকটিকিতে আরশোলা ধরেছে। আরশোলাটাকে মারার জন্য টিকটিকি অনেকবার ঝাপটা মারে। টিকটিকির যা স্বভাব—অসীম ধৈর্য নিয়ে থেমে ঝাপটা মারতে মারতে ওকে শেষ করবে। কাঠের জানলায় ঐ রকম আওয়াজ হচ্ছে ঝাপটা মারার। আমার এই সিদ্ধান্তে আমি এতদূর নিশ্চিন্ত হয়ে গেলুম যে, উঠে গিয়ে মিলিয়ে দেখারও ইচ্ছে হল না। ঘুমিয়ে পড়লুম পাশ ফিরে।

আজ সে জন্য কত অনুতাপ হয়। হয়তো টিকটিকি নয়—সেই

আত্মহত্যাকারিণী অষ্টাদশী মেয়েটি আসতে চেয়েছিল আমার ঘরে। দুটো কথা বলতে এসেছিল। আসবার আগে ভদ্রভাবে অনুমতি চেয়েছিল। আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। আজকাল ভূত আর ভগবান তো একই—অবিশ্বাসীর কাছে আসে না একেবারেই। ভয় দেখাতেও আসে না।

কিন্তু আমি যদি কোনো অলৌকিকের দেখা না পেয়ে থাকি—তবে 'অলৌকিক' নামে এ লেখাটা লিখছি কেন? না, পেয়েছিলাম একবার। একটি অসম্ভব অলৌকিক দৃশ্যের রাত্রি। চক্রধরপুর থেকে রাঁচী যাবার রাস্তায়, পাহাড়ের ওপরহে সাডি ডাকবাংলোয় একবার বেড়াতে গিয়েছিলুম কয়েক বন্ধু। চারপাশে জঙ্গল—সন্ধের পর ভাল্লুক আর চিতাবাঘের ভয় আছে—রাস্তার পাশে এই বাংলো—আর চতুর্দিকে পনের মাইলের মধ্যে কোনো জনমানব নেই। সন্ধের পরই অন্ধকার এবং স্তব্ধতা একসঙ্গে ছেয়ে আসে। মাঝে মাঝে শুধু দু'একটা ট্রাক তীব্র আলো জেলে ঝড়ের বেগে ছুটে যায়—ডাকাতির ভয়ে কোথাও না থেমে।

কয়েকদিন তাসটাস খেলে হৈ-হুল্লোড় করে কাটলো। তারপর আর সন্ধে কাটতে চায় না। কি বিপুল দীর্ঘ সন্ধেগুলো। সুতরাং একদিন আঠার মাইল দূরে ওরা ওঁদের গ্রামে হাট হবে শুনে আমরা দুপুরবেলাই একটা ট্রাক ধরে চলে গেলাম। চাল, হাঁস, মুরগী, কাচের চুড়ি, আয়না আর হাঁড়িয়া ও জুয়ার আড্ডা নিয়ে ছোট্ট গ্রাম্য হাট। সন্ধের পরেই ভেঙে গেল। তখন সমস্যা হল আমাদের ফেরা নিয়ে। কি করে অতখানি রাস্তা ফিরে যাবো—কোনো ট্রাক আমাদের নিতে চায় না। শেষে একটা সিমেণ্টের ট্রাক আমাদের পৌঁছে দিতে রাজী হল বাদগাঁও পর্যন্ত। সেখান থেকে আমাদের বাংলো ছ' মাইল। হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

জমাট অন্ধকারে পাকা পিচের রাস্তা ধরে চুপচাপ হাঁটছিলুম আমরা খুব সাবধানে। যে কোনো সময় ছুটন্ত ট্রাক আমাদের

চাপা দিয়ে যেতে পারে—এখানে আর কে দেখছে। হাঁটতে একদম ভাল লাগছিল না।—শেষে, কে এই হাটে আসার প্রস্তাব দিয়েছিল সেই নিয়ে খিটিমিটি বেধে গেল। তারপর তুমুল ঝগড়া। আমি ঝগড়ায় এমন উন্মত্ত হয়ে গেলাম যে, পাহাড়ের ধার দিয়ে নিচে নেমে-যাওয়া একটা পায়ে-চলা রাস্তা দেখে বললুম, আমি ঐ রাস্তায় যাবো—ঐটাই সর্টকাট। কেউ আমার সঙ্গে যেতে রাজী হল না, দু'একজন আমাকে বারণ করলো। আমি তখন নামতে শুরু করেছি।

খানিকটা বাদে বুঝতে পারলুম কি ভুল করেছি। পায়ে-চলা পথ আর দেখা যায় না, মিলিয়ে গেছে জঙ্গলে। আমি নামার ঝোঁকে অনেকখানি নেমে এসে দাঁড়ালাম, বুঝতে পারলাম ফেরার আর উপায় নেই। খাড়া পাহাড়—অতিকষ্টে ঝোঁক সামলে নিচে নামা যায়। কিন্তু ওপরে ওঠা যায় না। খানিকটা ওঠার চেষ্টা করে হাঁপিয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখলুম এতদূরে নেমে এসেছি যে, ওপরের রাস্তাটা আর দেখা যায় না। পায়ের কাছে অনেকটা সমতল হয়ে এসেছে—শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল, কোথাও এক বিন্দু আলোর চিহ্ন নেই। আমার সঙ্গে হাট থেকে কেনা একটা বাঁশের ছড়ি—আর কিছু না, একটা টর্চ না পর্যন্ত। আমি জঙ্গলে পথ হারালাম।

মনে আছে সেই রাত্রির কথা। ভাল্লুক আর চিতাবাঘ বেরোয় ঐ জঙ্গলে শুনেছিলাম, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর পাহাড়ে চিতাবোড়া সাপ, যার একটা আমরা আগের দিন নিজেরাই দেখেছিলাম। বন্ধুদের নাম ধরে ডাকলুম। কোনো সাড়া নেই। ওরা শুনতে পাচ্ছে না বা এগিয়ে গেছে। বেশী ডাকতেও সাহস পেলুম না—শব্দ করতে যেন ভয় করছিল। পাগলের মতো হন্তে হয়ে ছুটতে লাগলুম। তারপর একবার ক্লান্ত হয়ে বসলাম এক খণ্ড পাথরের ওপর। ছড়িটা দিয়ে চারপাশ পিটিয়ে দেখে নিলাম সাপ আছে কিনা কাছে। বসে থেকে এমন অসহায় লাগতে লাগলো। কোনো

গাছের ওপর বসে যে রাত কাটাবো তারও উপায় দেখলুম না—লম্বা লম্বা শালগাছগুলো অনেকদূর উঠে গেছে সিধেভাবে—তারপর ডালপালা ছড়িয়েছে। ও গাছে চড়া আমার সাধ্য নয়।

চুপ করেই বসে রইলুম। হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া দিল, কেঁপে উঠলো গাছের পাতাগুলো। আমি স্পষ্ট গলায় আওয়াজ শুনতে পেলাম, আহা-হা, লোকটা, লোকটা। ফিস্‌ফিস্ করে কেউ বললো, আমার মাথার উপরের গাছটা থেকেই। আমি একটু নড়েচড়ে বসলুম। আবার এক ঝলক হাওয়া দিতে সামনের গাছ থেকে ফিস্‌ফিস্ শব্দ হল, আহা-হা লোকটা লোকটা। আমি উপরের দিকে তাকালুম। দুটো গাছ যেন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বলছে, আহা-হা, লোকটা লোকটা। তারপর বেশ জোরে হাওয়া দিল একবার—আশেপাশের সবগুলো গাছ বলে উঠলো: আহা-হা, লোকটা লোকটা।

মনের ভুল সন্দেহ কি। কিন্তু এরকম মন বা কানের ভুল হবেই বা কেন? শুনেছি মরুভূমিতে অনেক লোক পাগল হয়ে যায়, আমিও কি শেষে জঙ্গলে? উঠে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। বেশ হাওয়া দিচ্ছে তখন, সারা বন বলছে, আহা-হা লোকটা লোকটা। নিষ্ঠুর কৌতুকের নয়, করুণ, সহানুভূতিময় সেই স্বর, যেন শত শত বৃক্ষ আমার দিকে তাকিয়ে আছে—আমি ছুটতে লাগলুম।

হঠাৎ একবার বাতাস থেমে গেল। তারপর আর এক ঝলক বাতাস বইতেই আমি অন্যরকম কথা শুনতে পেলুম। এইখানেই অলৌকিক দৃশ্যের আরম্ভ। আমি থেমে দাঁড়ালুম। এবার শুনতে পেলুম—ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। এই প্রথম শিহরণ হল। গাছের পাতাগুলো দুলে দুলে সরসর শব্দ করে আমাকে বলছে, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে আমি পিছন ফিরে হাঁটতে লাগলুম। আবার শুনতে পেলাম: ওদিকে নয়, ওদিকে নয়।

চিৎকার করিনি, কিন্তু মনে মনে জিজ্ঞেস করলুম, কোন্ দিকে?

বোবা বৃক্ষেরা কথার উত্তর দেয় না। শুধু নিজেরা কথা বলে, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। কি রকম বোবা ওরা কি জানি।

আমি ডানদিকে ঘুরলুম। আর কোনো কথা নেই। হাওয়া থেমে গেছে। এবার সবাই আমাকে দেখছে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। ডান দিকেই হাঁটতে লাগলুম। বেশ কিছুটা হাঁটার পর আবার হাওয়া উঠলো। আবার শব্দ উঠলো, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। থেমে দাঁড়িয়ে আবার ডান দিকে বাঁক নিলুম। তখনও শব্দ থেমে গেল।

তারপর যতক্ষণ হেঁটেছি—ভুলে গিয়েছিলাম বাঘ-ভাল্লুক আর সাপের কথা। শুধু উৎকর্ণ হয়ে শুনেছি গাছের পাতার সরসরানি। মাঝে মাঝে থেমে ওদের নির্দেশমতো চলেছি। একটু পরেই দেখতে পেলুম, দূরে ডাক-বাংলোর আলো, শুনতে পেলুম বন্ধুদের গলার আওয়াজ।

জেটিঘাট

তিনখানা খড়ের নৌকো লিজ নিয়েছে দানসা, আর ফেরিঘাটের টিকিট কাটে ওমর। দুজনে এক ছাউনির নিচে বসে।

দানসার খাটুনি বেশি, কারণ কারবারটা তার নিজের। এক সিজনের জন্য নৌকোগুলো সে লিজ নিয়েছে, এপার থেকে ওপারে খড় বোঝাই করে চালান দেয়। কখনও ইট কিংবা আলুর বস্তাও যায়। পাঁচজন মজুর খাটাতে হয়। নৌকোগুলোতে খড় কিংবা অন্য মাল বোঝাই করার সময় সে নিজেও হাত লাগায়, জোয়ারের সময় কোমরজলে নামতে হয়। নৌকোগুলো ছেড়ে গেলে সে ছাউনিতে বসে একটু জিরোয়।

ওমরের কাজ খুবই হাল্কা। নদী শান্ত থাকলে দিনে বড়জোর দুবার করে ফেরি যায়। তাও প্যাসেঞ্জার লঞ্চ নয়, বার্জ। গাড়ি, লরি, টেম্পো পারাপার করে। সরকারি ব্যবস্থা। কাছেই সমুদ্র, জোরে বাতাস বইলে এখানকার জলেও সমুদ্রের মতন ঢেউ ওঠে, তখন জেটির কাছে বার্জ ভিড়তে পারে না। সেই সময় পারাপার বন্ধ। ওমরের কাজ চুপচাপ বসে বিড়ি টানা। সেই ঢেউয়ের মধ্যেও দানসার নৌকোগুলো ঠিক চলে যায়, কাজ বন্ধ হলেই তার ক্ষতি।

যখন বাতাস থাকে না, মেঘ থাকে না, তখন ঠাটা-পোড়া রোদ। সেইজন্য দানসা একটা ছাউনি বানিয়ে নিয়েছে। আল্‌গা ইটের দেয়াল, ওপরে একটা তেরপল বেছানো, মেঝেতে খড় পাতা। রাত্তিরে এখানে শুয়ে থাকাও যায়।

একবার বার্জ ছেড়ে গেলে ফিরতে ফিরতে দু-আড়াই ঘণ্টা লেগে যায়। তখন ওমর পা ছড়িয়ে নদীর দিকে চেয়ে বসে থাকে।

মোহনার কাছাকাছি নদী, তাই সারা বছরই অতি জীবন্ত। ভাটার সময় নেমে যায় অনেকখানি, আর জোয়ারের সময় ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ একটু একটু এগিয়ে আসে। কাদার ওপর গেঁথে থাওয়া নৌকোগুলোকে জিভ দিয়ে চাটে। জেটির ওপর জল লাফিয়ে উঠে আসে অনেকখানি।

নদী ছাড়া কিছু মানুষজনও দেখা যায়। কাছাকাছি দশ বারোজন সকাল থেকে জাল পাতা আর জাল তোলার কাজে ব্যস্ত থাকে। আজকাল বাগদা চিংড়ির পোনার খুব চাহিদা। দামও ভাল পাওয়া যায়। প্রায় আলপিনের মত সাইজ, তাও স্বচ্ছ, খালি চোখে বলতে গেলে দেখাই যায় না, সেই চারা-চিংড়িও এরা আজকাল ধরতে শিখেছে। অন্য মাছ ধরার আগ্রহ নেই কারুর।

নতুন জেটি হয়েছে। তাই নতুন বসতি, অন্য জায়গা থেকে জেলেরা এসে ঝুপড়ি বেঁধেছে এখানে। জলে নেমে যারা যারা জাল পাতে, তাদের মধ্যে জনা পাঁচেক স্ত্রীলোকও আছে। নামেই স্ত্রীলোক, বুক নেই, পাছা নেই, যেন শিল নোড়ায় বাটা চেহারা, চাবুক খাওয়া মুখ। ওদের মধ্যে একমাত্র আমিনাই খানিকটা চলন-সই, তাও আহামরি কিছু নয়। চোখ দুটো কুতকুতে, তবু মুখে একটা তেলতেলে ভাব আছে, আর উরুর গোছটা ভাল। সকালবেলা যখন কাদার মধ্যে নেমে নাইলনের লম্বা বেড়াজালের খুঁটিগুলো বাঁধে আমিনা, তখন সে তার কস্তা ডুরে শাড়িটা গাছ-কোমর করে পরে থাকে। জোয়ার আসার পর জল একটু একটু করে বাড়তে থাকে, আমিনাও তার শাড়িটা একটু একটু উঁচুতে গুটিয়ে নেয়। পায়ের ডিম ছাড়ায়, হাঁটু ছাড়ায় উরুর মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে যায়। তারপর সে শাড়িটা আবার নামায়, একসময় তার বুক জল হয়ে যায়। শাড়ি তার ভিজবেই, নদীতে নেমে জাল পাতবে অথচ পরনের কাপড় ভিজবে না, এ কখনও হয়? তা বলে প্রথম থেকেই সে শাড়ি না ভিজিয়ে উরু পর্যন্ত তোলে কেন? ওমর এ রহস্যটা

-বুঝতে, পারে না।

প্যাসেঞ্জার লঞ্চের জেটি আলাদা, সেখানে লোকজন বেশি, কিছু দোকানপাটও আছে। লঞ্চ চালায় প্রাইভেট কোম্পানি, তারা যাত্রীবোঝাই করে লঞ্চ ছাড়ে, বেশি প্যাসেঞ্জার হয়ে গেলে একস্ট্রা ট্রিপ দেয়। আর এই বার্জের জেটিতে আসে শুধু কিছু লরি আর টেম্পো, কদাচিৎ দু একখানা প্রাইভেট লরি। দশ বারোজন জেলে-জেলেনী ছাড়া অন্য মানুষজন প্রায় দেখাই যায় না।

একখানা মারুতি ভ্যান গাড়ি জোরে চালিয়ে এসে সোজা চলে গেল জেটির শেষ প্রান্তে। গাড়ি থেকে নামল লাল গেঞ্জিপরা এক ছোকরা। জেটির গায়ে যাতে বার্জ বা লঞ্চের সরাসরি ধাক্কা না লাগে সেইজন্য কয়েকটা টায়ার বাঁধা আছে। সেইরকম একটা টায়ার ধরে লাফিয়ে বার্জটায় উঠে গেল ছোকরাটি। দূরের ছাউনিতে পা ছড়িয়ে বসে ওমর দেখছে। দানসা একটু আগে একটা খড়ের নৌকো বোঝাই করে ছেড়েছে, পরিশ্রম হয়েছে খুব, সে একপাশে এলিয়ে শুয়ে আছে খড়ের গাদায়।

লাল গেঞ্জিপরা ছোকরাটি আবার লাফিয়ে জেটিতে নেমে জোরকদমে এদিকে ফিরে এল। টিকিটঘর বলে কিছু লেখা নেই, ওদিককার প্যাসেঞ্জার ফেরির মতন এদিকে টিকিটঘরও নেই, সরকারি বাবস্থায় ওমরের শুধু একটা টুল পেতে বসে থাকার কথা, সেটাই অফিস।

ছোকরাটি এসে একশ টাকার একটা নোট বার করে বলল, গাড়ির জন্য কত লাগে, ষাট না আশি?

ওমর টাকার প্রতি কোনও আগ্রহ না দেখিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, আজ আর যাবে না। ছোকরাটি রীতিমতন চমকে গিয়ে বলল, যাবে না? কেন?

ওমর বলল, যাবে না, যাবে না!

ছোকরাটি এবার গর্জন করে উঠে বলল, ভাল করে মুখের দিকে

তাকিয়ে কথা বল। বার্জ জেটিতে লেগে আছে, অথচ তুমি বলছ যাবে না, তার মানে?

গর্জন শুনে একটুও বিচলিত হল না ওমর। অবজ্ঞার সঙ্গে গাল চুলকোতে চুলকোতে বলল, জাহাজ থাকলেই যেতে হবে? সাড়ে বারোটায় বান আসবে। তখন ওপারের জেটি পুরো ডুবে যাবে। আপনার গাড়ি ওপারে গিয়ে নামাবেন কোথায়? মাঝ গঙ্গায়?

ছোকরাটির ক্রোধের সঙ্গে এবার মিশল বিস্ময়। হাতঘড়ি দেখে সে বলল, এখন এগারটা দশ। ওপারে যেতে কতক্ষণ লাগে আমি জানি না? বড়জোর পঁয়তিরিশ মিনিট। বান আসার সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে? আমায় টিকিট দাও।

হবে না।

তার মানে? টিকিট দেবে না?

একখানা গাড়ি পার হয় না। পেছনে গিয়ে অপেক্ষা করুন, আরও অন্তত দুখানা গাড়ি না এলে জাহাজ ছাড়বে না।

যদি আর গাড়ি না আসে?

তাহলে যাবে না।

অন্য গাড়ি আসতে আসতে যদি বান এসে যায়?

বলেছি তো, যাবে না।

ছোকরাটি এবার অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাল। তার অদম্য ইচ্ছে হচ্ছে এই শুকনো, ঢ্যাঙা লোকটার মুখে দুখানা ঘুসি কষাতে। কিন্তু তাতে তার সমস্যার সমাধান হবে না। সারেং-এর সঙ্গে সে কথা বলে এসেছে। সারেং-এর যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু টিকিটবাবু টিকিট না দিলে সে বার্জ ছাড়তে পারবে না।

ছোকরাটি এবার মেজাজ সামলে বলল, অন্য গাড়ি যদি না আসে···আমার খুব বিপদ হয়ে যাবে। আমাকে আজ ওপারে যেতেই হবে। ওমর পিচ করে একপাশে থুতু ফেলে বলল, একখানা গাড়ি নিয়ে জাহাজ ছাড়ার নিয়ম নেই, বললাম তো।

ছোকরাটি আরও অনুনয় করে বলল, একটু ব্যবস্থা কর। আমার বিশেষ দরকার। একজনের অসুখ। তুমি না হয় পুরো একশ টাকাই রাখ।

ওমর এবার খেঁকিয়ে উঠে বলল, কেন জ্বালাতন করছেন? অন্তত তিনখানা গাড়ি না হলে আমি টিকিট দেব না, ব্যস্।

ওমর পেছন ফিরে বসে বিড়ির বাণ্ডিল খুঁজতে লাগল।

ছোকরাটি সরে গেল এবার। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল জেটিতে। মাঝেমাঝেই রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। আর কোনও গাড়ির চিহ্ন নেই।

ওমর বিড়ি ধরিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

দানসা সব শুনছিল। এবার সে জিজ্ঞেস করল, ভদ্রলোককে টিকিট দিলি না কেন রে? ওমর বলল, একখানা গাড়ির জন্য জাহাজ ছাড়বে? মোটে আশি টাকা এক গাড়ি, আর কত টাকার ডিজেল পুড়বে তা জানিস?

দানসা বলল, ডিজেল পুড়বে তো গভর্নমেণ্টের।

আমি জেনেশুনে গভর্নমেণ্টের ক্ষতি করব? কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল?

আরে, গভর্নমেণ্ট কি লাভের জন্য ফেরি চালাচ্ছে? চালাচ্ছে মানুষের উপকারের জন্য। রেল নেই, বাস নেই, ব্রীজ নেই, মানুষ ওপারে যাবে কী করে? মালপত্তর নিয়ে গাড়ি যাবে কী করে? তাই গভর্নমেণ্ট বিনা লাভে এই ব্যবস্থা করেছে। পাঁচখানা গাড়িও যদি যায়, পাঁচ আশি হল গে চারশ, তাতেও কি এক টিপের খরচ ওঠে? ডিজেল খরচ, সারেং, সাতজন হেল্পার···

তবু গভর্নমেণ্টের আইন আছে, মোটে একখানা গাড়ি হলে জাহাজ যাবে না।

পরশুদিন তুই ব্রজেন সাহার লরি পার করালি। সেও তো মোটে একখানাই ছিল। ব্রজেনের সঙ্গে তোর খাতির আছে।

বেশ করেছি। আমার ইচ্ছে। গভর্নমেণ্ট আমাকে এখানে রেখেছে, আমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।

সে তো ঠিক। এই বাবুটা বলল, ওর বড় বিপদ। ছ্যাখ না কেমন ছটফট করছে।

আরে রাখ। ঠেলায় পড়লে অমন বিপদের কথা সবাই বলে। শেষকালে তোর কাছে কাকুতি-মিনতি করল, দিয়ে দে না টিকিট। মানুষের উপকার হবে।

ছ্যাখ দানসা, এই লোকটার সঙ্গে যদি হাটে-বাজারে আমার দেখা হত, ভাল করে কথা বলত আমার সঙ্গে, আমাকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করত; ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলি না? প্রথমেই কেমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছিল।

এবার দানসাও হেসে ফেলল।

সত্যি কথাই তো, এই জেটিঘাট থেকে উঠে গেলে, রাস্তায়, হাটে-বাজারে ওমর একজন অতিসাধারণ নিরীহ মানুষ। লম্বা, সিড়িঙ্গে চেহারা, একজন এলেবেলে গরিব। শুধু এই জেটিঘাটে বসে টিকিট দেবার সময়েই তার যত তেজ। গাড়িওয়ালা বাবুদেরও সে ফিরিয়ে দিতে পারে। ওমর এই ক্ষমতাটা উপভোগ করে। ঐ লাল গেঞ্জি পরা ছোকরা ওকে কুড়ি টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিল, ওমর তাও নিল না, ওকে নিরাশ অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে ওমর কুড়ি টাকার চেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছে।

দানসা তবু আবার বলল, আজ হাট বন্ধ। আজ আর গাড়ি আসবে না। বান ডাকার আগে লোকটাকে পার করে দে না, ওমর। মানুষের উপকার করলে নিজেরও উপকার হয়। মনটা ঠাণ্ডা হয়।

ওমর বলল, আরে এই শালারা নিমকহারাম হয়। আজ উপকার করব, কাল দেখবি এসে আবার চোখ রাঙাবে।

দানসা বলল, আহারে, ছ্যাখ ছ্যাখ, লোকটা বোধহয় এবার ভিরমি

খেয়ে পড়বে। খুব দরকার না হলে···দে দে, একটা টিকিট দে। ওমর এবার হাতছানি দিয়ে ছোকরাটিকে ডাকল। সে আগে থেকেই একটা কুড়ি টাকার নোট বার করে রেখেছিল ঘুষের জন্য নয়, বিনা কারণে লোকটির উপকার করছে, এটা বুঝিয়ে দিয়ে, টিকিটটা বাড়িয়ে বলল, যান, যান, দৌড়ে চলে যান।

লোকটা যে এতক্ষণ অনিশ্চতায় কষ্ট পেয়েছে, তাতেও ওমরের কম আনন্দ হয়নি। ছাউনির মধ্যে রান্নার কোনও ব্যবস্থা নেই, দুপুরের দিকে ওরা অন্য জেটিঘাটের হোটেলে খেতে যায়। একটা মুসলমানের হোটেল, অন্য হোটেলটায় সেরকম কিছু লেখা নেই। রাত্তিরের দিকে নিরিবিলি থাকে, তখন ওমর আর দানসা অন্য হোটেলটায় খায়, ওখানে রান্না ভাল, ম্যানেজারটাও মজলিসি ধরনের। দিনের বেলা যাত্রীদের খুব ভিড় থাকে, তাই ওখানে না গিয়ে ওরা মুসলমান হোটেলেই ঢোকে। এখানে খাবার একটু সস্তা, কিন্তু মালিকটা তিরিক্ষি মেজাজের, কোনও রান্না নিয়ে অভিযোগ করলেই সে দাঁত খিঁচিয়ে বলে ওঠে, না পোষায়, এস না। কাছাকাছি আর কোনও মুসলমানের হোটেল নেই। ব্যাটা সেই সুযোগটা নেয়।

আটখানা করে রুটি, এক প্লেট শুকনো গোস্ত আর পেঁয়াজ দিয়ে ওরা খাওয়া সেরে নিল। ওমর দই নিল, দানসা দই খায় না।

দাম দিয়ে বেরিয়ে আসার পর পাশের দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে দানসা বলল, তোর আর আমার কাছ থেকে সমান পয়সা নিল কেন রে? তুই দই খেলি।

ওমর একগাল হেসে বলল, চেপে যা। ও শালা মালিকটা ভুলে গেছে। আমার আজ একটা টাকা লাভ।

দানসা বলল, ভুল করে দাম নেয়নি। এঃ হে, ওর ক্ষতি হয়ে গেল। দই তো ও বাজার থেকে কিনেছে। যা, ওমর, টাকাটা দিয়ে আয়।

ওমর চোখ কপালে তুলে বলল, ফেরত দিতে যাব? তোর মাথা খারাপ?

দিবি না? দই খেয়েছিস, তার দাম দিবি না?

ও নেয়নি কেন? সেটা আমার দোষ নয়। একদিন আমি সাতখানা রুটি খেয়েছিলুম, ও হিসেবে ধরেছিল ন'খানা। তোর মনে নেই? কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করল না? চল্লিশ পয়সা বেশি নিয়ে নিল।

ও ভুল করেছিল। তা বলে তুই জেনেশুনে ওকে ঠকাবি? একটা টাকার জন্য পাপ করবি?

ভাখ দানসা, তুই শালা আমার বিবেক নাকি? সবসময় আমার পেছনে টিকটিক করিস কেন বল্ তো?

তুই যদি নিজের থেকে টাকাটা ফেরত দিতে যাস, দেখবি ও যেমন অবাক হবে, তেমন খুশি হবে। মানুষকে খুশি করার মতন পুণ্যি কি আর কিছুতে হয়? যা, যা। একটা টাকার তো মোটে মামলা।

ওমর আরও কিছুক্ষণ তর্ক করে। বিরক্তিতে তার কপাল কুঁচকে যায়। তবু সে একসময় দানসার কাছে হার মানে, হোটেলের কাউন্টারে গিয়ে একটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে আসে।

পান খেয়ে গল্প করতে করতে হাঁটে দুজন। সরকারি জায়গায় অনেক ঝুপড়ি উঠে গেছে। আরও নিত্যনতুন গজাচ্ছে। কিছুদিন আগে জায়গাটা ছিল ফাঁকা। শিগগিরই এটা একটা গঞ্জ হয়ে যাবে। দূর দূর গ্রাম থেকে যে-যেমন পারে জায়গা দখল করে নিচ্ছে। ওমর আর দানসারও দুটো জায়গা নেওয়া আছে, কিন্তু ঘর তোলেনি। এখানে সংসার পাতার কথা এখনও ভাবেনি। ওমরের নতুন চাকরি, আর দানসা তার কারবারে এখনও বিশেষ লাভের মুখ দেখেনি।

একটা ঝুপড়ির বাইরে আমিনা এঁটো-কাঁটা খাওয়াচ্ছে কুকুরকে।

এখন একটা শুকনো শাড়ি পরেছে, চুল আঁচড়াচ্ছে। সকালবেলা যখন জলে জলে থাকে, তখন একে অন্যরকম দেখায়। ডিজেল হাঁড়ির মতন গায়ের রঙ, নাকটা বোঁচা, তবু মেয়েটার একটা কিছু চটক আছে।

সবাই এখানে নতুন এসেছে, কেউ কারুকে ভাল করে চেনে না। আমিনাদের ঝুপড়িতে থাকে এক বুড়ো আর একটা ষোল সতের বছরের ছেলে। ছেলেটা ওর ভাই আর বুড়োটা ওর স্বামী। একটা পিঠ বাঁকা বুড়োর সঙ্গে কেন ওর বিয়ে হল কে জানে! বুড়োটা মাঝেমাঝেই খকখক করে কাশে। তবু তার তেজ আছে, আমিনাকে বকে প্রায়ই, ভাইটাকেও বকে।

ওমর ভাবল, এই আমিনাকে সুযোগ বুঝে একদিন অন্য কেউ খাবে। বিয়ে হয়ে গেলেই যে সে স্ত্রীলোককে অন্য কেউ খাবে না, তার কোনও মানে নেই। অন্তত এখানে ওসব নিয়ম খাটে না। বুড়োর যুবতী স্ত্রী, তার ওপর কেউ না কেউ ভাগ বসাতে চাইবেই। এখন কথা হচ্ছে, কে আগে খাবে।

ওমরের শরীরটা চনমন করে ওঠে।

দানসা তার কাঁধে হাত রেখে বলল, ঐ আমিনার দিকে নজর দিস না যেন!

ওমর দারুণ চমকে গিয়ে বন্ধুর দিকে তাকাল।

দানসা আবার বলল, ওর ভাইটাকে দেখেছিস তো, খুব গোঁয়ার। বয়েস কম হলে কী হয়, শরীরে তাগদ আছে। আর বুড়োটার নজরও খুব সরু। দেখিস না, আমিনাকে কারুর সঙ্গে কথা বলতে দেয় না!

ওমর বলল, আমার নজর দিতে ভারি বয়ে গেছে।

দানসা বলল, গভর্নমেন্টের চাকরি পেয়েছিস, তোর আর চিন্তা কী? এবার বিয়ে-শাদী কর।

ওমর ঠোঁট ওল্টাল। মাইনে তিনশ চল্লিশ টাকা। ঐ টাকায়

সংসার হয়? আগে কিছু জমুক।

দানসা বলল, ডাগর-ডোগর দেখে বউ আনবি, তাকে দিয়ে কাজ করাবি। পানিতে নেমে মাছ ধরতে শিখলেই টাকা আসবে। মেয়েছেলেরা এই কাজ ভাল পারে। তারপর কাচ্চা-বাচ্চা হবে। আল্লা দোয়া করবেন। নিজের ছেলেপুলে না হলে পুরুষমানুষের মন শান্ত হয় না।

ওমর বলল, রাখ, ও কথা রাখ।

আমিনা মেয়েটি সত্যিই কম কথা বলে। কারুর সঙ্গে মেশে না। সামনাসামনি চোখাচোখি হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু নদীতে জাল ফেলতে নেমে যখন একসময় শাড়ি ভেজাতেই হবে, তবু কেন সে অল্প জলে উরু পর্যন্ত শাড়ি গুটিয়ে রাখে, এটাই ওমর বুঝতে পারে না।

কয়েকটা দিন একঘেয়ে যাবার পর ওমর ছটফটিয়ে উঠল। কারুর ওপর সে ব্যক্তিত্ব ফলাতে পারছে না, কারুর কাকুতি-মিনতি অগ্রাহ্য করার আনন্দ পাচ্ছে না। আজ আবার বন্‌ধ। ডায়মণ্ডহারবারে কী যেন গণ্ডগোল হয়েছিল কাল, তারজন্য সারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বন্‌ধ। এই ফেরিঘাটের সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবারের ঝঞ্ঝাটের কোনও সম্পর্ক নেই। তবু ভয়েই আজকাল সবাই দোকানপাট বন্ধ করে দেয়। প্রাইভেট কোম্পানির প্যাসেঞ্জার লঞ্চ চলবে না, হোটেলেও ঝাঁপ ফেলা।

শুধু বার্জ সার্ভিস চালু রাখার কথা, কারণ সেটা সরকারি। যদি গাড়ি আসে পারাপারের জন্য। সে সম্ভাবনা খুবই কম।

জেলেরা বন্‌ধ-হরতাল মানে না। তারা সবাই জলে নেমেছে।

ওমর জেটিঘাটের মাঝখান পর্যন্ত হেঁটে গেল। আমিনা আর অন্য দুটি স্ত্রীলোক সেখানে জাল ছড়াচ্ছে। সবাই জালের একটা দিক জেটির সঙ্গে বাঁধে।

ওমর গম্ভীরভাবে বলল, এই, এখান থেকে জাল সরাও। জাল

সরাও!

মেয়েরা অবাক হয়ে তাকাল। প্রতিদিন জাল বাঁধা হচ্ছে, এরকম কথা কখনও শোনেনি। ওমর বলল, জাল সরাও! হাঁ করে দেখছ কী?

একটি স্ত্রীলোক বলল, কেন? জাল খাটাব না কেন?

ওমর বলল, এটা সরকারের সম্পত্তি। এখানে জাল বাঁধার কে হুকুম দিয়েছে?

স্ত্রীলোকটি ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, নদীর পানি সরকারের সম্পত্তি? মাছ ধরা যাবে না?

ওমর ধমক দিয়ে বলল, কোথাকার উজবুক হে! নদীর পানি সরকারের, তা কি আমি বলেছি? এত বড় নদী, যেখানে ইচ্ছে মাছ ধর গে, কে বারণ করেছে? এই জেটির সঙ্গে বাঁধা চলবে না। আমার জাহাজ যাওয়া-আসার অসুবিধে হয়। খোল, খোল!

সবাই জেটির সঙ্গে জালের একটা দিক বাঁধে। তারপর পরপর খুঁটি চলে যায় অনেকদূর পর্যন্ত জেটির মতন এমন মজবুত খুঁটি তো আর হয় না। এখন সব খুলে আবার বাঁধতে হবে? স্ত্রীলোকেরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকায়। আমিনা শুধু জলের দিকে চেয়ে থাকে।

অন্য জেলেরাও কাছাকাছি চলে আসে। আমিনার স্বামী আর ভাইও আসে। কেউ কেউ তর্ক জুড়ে দেয়। কিন্তু ওমর অনড়। সে সরকারের প্রতিনিধি, সরকারের সম্পত্তি সে অন্যদের ইচ্ছেমতন ব্যবহার করতে দেবে না।

খানিকক্ষণ তর্কের পর বেশ মেজাজ দেখিয়ে ওমর বলল, অত কথা কিসের? নিজেরা খুলবে, না আমি খুলে দেব?

সত্যিই সে একটা জালের দড়ি খোলার জন্য টান মারে।

দানসা একটা নৌকোয় খড় বোঝাই করছিল। সেও বন্ধ মানেনি। একটা নৌকো তো ওপারে যাক। ওদিকের বাবুরা যদি

আটকায়, তাহলে সে আর অন্য নৌকো ছাড়বে না আজ।

গোলমাল শুনে কোমরজল ঠেলে ঠেলে জেটির কাছে এসে সে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে ?

আমিনার স্বামী বলল, জেটিতে জাল বাঁধা যাবে না বলছে।

দানসা ওমরের দিকে তাকাল।

ওমর যুক্তি দেখিয়ে বলল, এরা সব জাল বেঁধে রাখে। আমার জাহাজ যাওয়া-আসার অসুবিধে হয়।

একজন জেলে বলল, জাহাজ লাগার সময় তো আমরা জাল খুলে নিই। জাহাজের চাকা লাগলে জাল ছিঁড়ে যাবে।

ওমর বলল, হ্যাঁ, জাল খুলে নাও, কিন্তু কখন খোল ? জাহাজ কাছে এসে ভেঁপু মারে। তার আগে তোমাদের হুঁশ হয় না। ভেঁপু শুনে তারপর তোমরা জাল খুলতে শুরু কর। তাতে আমাদের টাইম নষ্ট হয়। গভর্নমেণ্টের টাইমের বুঝি দাম নেই ? অ্যাঁ ? দানসা বলল, হ্যাঁ, সেটা ঠিক কথা। সরকারের টাইমের দাম আছে। কিন্তু জেলেদের যাতে সুবিধে হয়, সেটাও তো সরকার দেখবে। জাহাজ তো দুবার মাত্তর আসে যায়। সারাদিন জেটি খালি পড়ে থাকে। জেটিতে জাল বাঁধলে জেলেদের সুবিধে হয়, ঠিক কিনা ? সরকার তো সেটাও দেখবে ?

তবে ওরা জাহাজ আসবার আগে আগে জাল খুলে নেয় না কেন ?

সেটাও ঠিক। ওগো, জাহাজ যখন ওপার থেকে মাঝ নদী পেরুবে, তখন জাল খুলতে শুরু করবে। হিসেব করে। পারবে না ?

অনেকেরই এই সমাধান মনোগতন হল।

ওমর এবার সবার মুখের দিকে তাকাল। মুখের ভঙ্গিটা উদার হয়ে গেল। বিচারের রায় দেবার সুরে সে বলল, ঠিক আছে, তাহলে আমি পারমিশান দিতে পারি। কিন্তু মনে থাকে যেন, ঠিক সময়ে···।

এই খুদে সাম্রাজ্যের সম্রাটের মতন ধীর পা ফেলে ওমর ফিরে যায় নিজের ছাউনিতে। পরম তৃপ্তির সঙ্গে বিড়ি ধরায়।

দুপুরবেলা একটা কাণ্ড ঘটল।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ, নদীর ওপর হা-হা করছে বাতাস, একটাও নৌকো চলছে না। খড়ের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে দানসা আর ওমর। একজনের ঘুমঘুম ভাব, অন্যজন বিড়ি টেনে যাচ্ছে। এমন সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়াল আমিনা। কলাপাতা চাপা দেওয়া একটা ডেকচি নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

ওমর তড়াক করে উঠে বসে বলল, ওটা কী? কলাপাতাটা উঠিয়ে দিল আমিনা। এক ডেকচি ভর্তি ভাত, তার ওপরেই একপাশে খানিকটা ঝিঙে-পোস্ত, আর একপাশে লট্‌কা মাছের চচ্চড়ি।

মৃদুস্বরে আমিনা বলল, আজ তো হোটেল বন্ধ।

দানসার গ্রামের বাড়ি সতের মাইল দূরে, আর ওমরের বাড়ি বসিরহাট। একদিনের ছুটিতে দানসা বাড়ি যাবার চাড় অনুভব করে না। আর ওমরের তো ঠিক ছুটিও নয়। কিন্তু যারা হোটেলে খায়, বন্‌ধের দিনে তাদের আহার জুটবে কী করে? সে কথা কেউ ভাবে না। দানসা একছড়া কলা কিনে রেখেছে, তাই খেয়ে খিদে মেটাবে। ওমর কিছু ভাবেইনি।

দানসা বলল, হোটেল বন্ধ বলে তুমি আমাদের জন্য ভাত নিয়ে এসেছ? তোমায় কে পাঠাল?

আমিনা কোনও উত্তর দিল না।

দানসা আবার বলল, তুমি কী ভাল মেয়ে গো! আমরা দুটো মদ্দ এখানে না খেয়ে পড়ে আছি, তুমি ঠিক নজর করেছ?

ওমর ভাবল, কার কথা বেশি ভেবে খাবার এনেছে আমিনা? দানসাটা কি মনে করছে ওর জন্য? দানসা আজ ওদের হয়ে ওকালতি করছিল, সেইজন্য? গাধা আর কাকে বলে! উকিল বড়,

না হাকিম বড়? আমিনারা বুঝেছে যে ওমরকে খাতির না করলে এই জেটির ধারে মাছ ধরা যাবে না।

আমিনা বলল, আমি পরে এসে বাসনটা নিয়ে যাব।

দানসা বলল, আমি ধুয়ে পৌঁছে দেব। তোমাকে আসতে হবে না।

ওমর ফস্ করে বলল, তোমরা তো রোজ রান্না কর, আমরা চাল কিনে দিলে দুটো ভাত ফুটিয়ে দেবে?

দানসা অবাক হয়ে ওমরের দিকে তাকাল। ওমর বলল, ওরা রেঁধে দিলে আমাদের আর রোজ রোজ হোটেলে খেতে হয় না। আমরা পয়সা দেব। চাল-ডাল কিনে দেব।

দুজনেই তাকাল আমিনার দিকে। আমিনা মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ, দেব না কেন?

এরপর থেকে ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেল। দানসা আর ওমরকে হোটেলে খেতে হয় না। আমিনা কিংবা তার ছোটভাই এসে খাবার দিয়ে যায়। ওমর আর দানসা পালা করে বাজার করে আনে। আমিনার স্বামীও খুশি, কারণ ওমর ওদের দই খাওয়ায়। বুড়ো দই খেতে খুব ভালবাসে।

আমিনা এখনও বেশি কথা বলে না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকায়। সেই দৃষ্টির সঠিক ভাষা ওমর বোঝে না, কিন্তু তার শরীর ঝনঝন করে। তার তুলনায় দানসা ওদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাতিয়েছে বেশি। দানসা মাঝে মাঝে আমিনাকে রান্নাবান্নায় সাহায্য করে। মজার কথা বলে। আমিনার ভাইটা তার বেশ ন্যাওটা।

এক-একদিন আমিনা বিকেলের দিকে কোথায় যেন যায়। একটু সেজেগুজে। ওমরের পছন্দ হয় না। এখান থেকে বাজার সাত মাইল দূরে। ওমর আর দানসার একটা ভাগাভাগির সাইকেল আছে। আমিনা কি বাজারে যায়? কেন যায়? ভাইটাকে

পাঠালেই তো পারে। ওমরের সন্দেহ হয়, আমিনা যেন অন্য কারুর মুখগহ্বরের দিকে এগোচ্ছে! তাহলে ওমর নয় কেন।

দানসা অবশ্য প্রশংসা করে খুব আমিনার। মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র ভাল, এদিক ওদিক চায় না। যাত্রী ফেরিঘাটের লোকজনের সঙ্গে ফচকেমি করে না। মাছের পাইকারদের সঙ্গে দরাদরিতে সে ওস্তাদ, কিন্তু ওরা অন্য কোনরকম সুবিধে নিতে পারে না।

সকালবেলা পুরো জোয়ার আসার আগে আমিনা প্রতিদিন উরু দেখায়। ওমর এক-একদিন জেটির মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমিনা তবু লজ্জা পায় না। ওমরের মাথায় আগুন জ্বলে। দানসার কথা মতন যদি ভাল মেয়েই হয়, তাহলে উরু ঢেকে রাখে না কেন?

একদিন বিকেলবেলা আমিনার স্বামী হঠাৎ খুব বমি করতে লাগল। প্রথম কয়েকবার কেউ তেমন খেয়াল করেনি। একসময় জেটির ওপর উঠে এসে নেতিয়ে পড়ল একেবারে। মনে হল চোখ উল্টে যাচ্ছে। নির্ঘাত কলেরা। প্যাসেঞ্জার লঞ্চ চলে গেল এইমাত্র। ফিরতে ফিরতে অন্তত আরও দেড় ঘণ্টা। ওদের একটা লঞ্চ আজ খারাপ। নদীর জলে খুব টান আছে। নৌকোয় যেতে অনেক সময় লেগে যাবে। অথচ বুড়োকে এক্ষুনি ওপারে নিয়ে যাওয়া দরকার। সাগরদ্বীপে চালু হেল্‌থ সেণ্টার আছে। সেখানে ওর চিকিৎসা হতে পারবে।

বার্জে দুটো লরি আর তিনটে ভ্যান চেপেছে। ছাড়বে এক্ষুনি। আমিনার ভাই সারেংকে অনুরোধ করেছিল তার দুলাভাইকে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু সারেং কলেরা-রোগী তুলতে রাজি নয়।

এগিয়ে এল ওমর। সারেংকে ডাকল। গম্ভীরভাবে বলল, মনে কর, আমার বাপের কলেরা হয়েছে, তুমি তাকে নিতে না?

সারেং তো-তো করতে লাগল।

ওমর একজন খালাসিকে ডেকে বলল, গণেশ, ওপারে নিয়ে

গেলেই শুধু চলবে না। ওরা হেল্‌থ সেণ্টার চেনে না। ওখানে পৌঁছে দিবি।

গণেশ জিজ্ঞেস করল, ওনার সঙ্গে আর কে যাবে?

আমিনাই যেতে চায়। সে বুড়োর মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। কিন্তু ওমর বলল, তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। তোমার ভাই যাক। একজন পুরুষমানুষ সঙ্গে থাকলে সুবিধে হয়।

ভাই-বোন দুজনেই চলে গেলে আমিনাদের ঘর কে দেখবে? এখানে চোরের খুব উৎপাত। বুড়োর সঙ্গে আমিনার ভাইটাকেই পাঠানো ঠিক হল। বার্জে উঠে ওমর নিজে বুড়োকে শুইয়ে দেবার ব্যবস্থা করল।

বার্জ এবার ছাড়বে। সারেং ওমরকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, আজ কি আবার ফিরতে হবে? একেবারে কাল সকালে ওদিককার গাড়ি নিয়ে চলে আসতাম? রাত্রে ওখানে আমার একটা কাজ ছিল।

ওমর কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল। ভোরবেলা এখান থেকেই প্রথম গাড়ির ফেরি ছাড়ার কথা। কিন্তু একদিন দেরি হলে ক্ষতি কী? সন্ধ্যের পর প্যাসেঞ্জার লঞ্চ বন্ধ। বুড়োকে হেল্‌থ সেণ্টারে ভর্তি করে আমিনার ভাইটা যদি ফিরতে চায়, কিসে ফিরবে? ফেরার কি দরকার? ওপারে এই জাহাজেই রাত্রে শুয়ে থাকতে পারবে। খালাসিরা ওকে খাইয়ে দেবে।

ওমর সারেংকে বলল, ঠিক আছে, ফিরতে হবে না।

তার মানে, আজ রাতে আমিনা একা থাকবে। আজই সেই রাত। আজই বুঝতে হবে আমিনার উরু খুলে রাখার রহস্য।

এর মধ্যেই অন্ধকার হয়ে গেছে। জেটি পার হয়ে এসে একটা দৃশ্য দেখে ওমর থমকে গেল। আমিনার কাঁধে হাত দিয়ে, প্রায় তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দানসা। ঢুকে গেল আমিনাদের ঝুপড়ির মধ্যে।

দাঁতে দাঁত ঘষে ওমর বলল, শালা, হারামি, কিন্তু এখন ওমর ওখানে যেতে পারে না। সে নিজেদের ছাউনিতে বসে গজরাতে লাগল। ধ্বংস করতে লাগল বিড়ির পর বিড়ি। হারামজাদা দানসাটার সঙ্গে আজ থেকে সম্পর্ক শেষ। কাল থেকেই ওমর নিজের জায়গাটায় একটা ঘর তুলতে শুরু করবে।

এক একটা মিনিট যেন এক এক ঘণ্টা। ওমর মাঝে মাঝে বাইরে এসে উঁকি মারছে। চাঁদ ওঠেনি। আকাশ অন্ধকার। কোথাও মানুষজন নেই। আমিনাদের ঝুপড়িতেও কোনও সাড়াশব্দ নেই। ওখানে কী করছে দানসা?

কতক্ষণ কাটল, এখন কত রাত?

এক সময় আমিনাদের ঝুপড়ির ঝাঁপ ঠেলে দানসা বেরুতেই ওমর সেদিকে ছুটে গেল।

দানসার হাত চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল নিজেদের ছাউনির দিকে।

দানসা বলল, ব্যবস্থা করে এলুম, ফতি এসে রাত্তিরে আমিনার ঘরে শোবে।

রাগের চোটে তোতলাতে লাগল ওমর। সে বলল, শালা··· আমি ওদের পাঠিয়ে দিলাম, তুই, তুই আমার আগে, তুই আমিনাকে, তুই ওকে···

দানসা একগাল হেসে বলল, আমি যে তোর বিবেক।

নিজের বাবার কাছ থেকে প্রায় সারাটা বাল্য-কৈশোর খুব বকুনি খেয়েছে বলে মনীশ ঠিক করেছে, সে তার ছেলেকে কখনও বকবে না। তা ছাড়া, শিশুদের পদে পদে বকুনি দিলে কিংবা তাদের সব কৌতূহল চরিতার্থ না করলে শিশুদের মানসিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে না, মহিলা ম্যাগাজিনগুলির এই ধরনের উপদেশও মনীশ খুব মানে। কিন্তু মহিলা ম্যাগাজিনের বিশেষজ্ঞরা মনীশের ছেলে বাপ্পাকে দেখেননি। সাড়ে ছ' বছর বয়েসে সে একটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিচ্ছু। কিছু দাড়ি কাঁচা এবং কিছু দাড়ি পাকা কেন তা জানবার জন্য বাপ্পা তার দাদুর দাড়ি টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করেছিল।

ছেলেকে প্রশ্রয় দিয়ে মনীশ মিটিমিটি হাসে, সব কিছু সামলাতে হয় সোমাকে। ট্রেন যাত্রা সোমার কাছে বিভীষিকার মতন। সাড়ে ছ'বছরের শরীরে একটি দৈত্যের মতন প্রাণশক্তি বাপ্পার, সে দু'মিনিট স্থির হয়ে বসতে পারে না। প্রথমে তাকে জানলার ধারের জায়গাটি দিতে হবে, একটু পরেই সে সব কটি জানলার ধারে বসতে চাইবে। ছুটে ছুটে সে অন্য জানলাগুলির কাছে যাবে, অন্য যাত্রীদের ঠেলে ঠেলে বসবে। অচেনা কোনও যাত্রীর যদি এই ফুটফুটে বাচ্চাটিকে দেখে বাৎসল্য জাগে, বাপ্পাকে কাছে টেনে আদর করতে চায়, তাহলেই বুঝবে মজা। হাত কামড়ে দেবার পর্যন্ত রেকর্ড আছে বাপ্পার। আর সমবয়েসী বা একটু বড় বয়েসী কোন বাচ্চাকে যদি পেয়ে যায়, তা হলে তার প্রতি বাপ্পার ব্যবহার হবে ছিঁচকে চোরের প্রতি ডাকাত সর্দারের মতন।

সোমা সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। বারবার উঠে সে বাপ্পাকে টেনে নিয়ে আসে। মায়ের শাসন একেবারেই গ্রাহ্য করে না ছেলে। মায়ের স্নেহময় হাতের জোরের চেয়ে তার দুর্বৃত্তপনার জোর অনেক বেশি। একটু পরেই আবার সে ছিটকে চলে যায়।

মনীশ উদার প্রশ্রয়ের সুরে বলে, আহা থাক্ না, চোখে চোখে রাখলেই তো হল।

সোমার তবু ভয় হয়, যদি দরজার কাছে গিয়ে বাইরে পড়ে যায়।

দীপ আর জয়া দু'জনেই বই পড়ছে। এমন একটা ছেলেকে নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকতে হলে গল্প জমে না। দীপ এমনিতেই বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারে না, বাপ্পার সঙ্গে ভাব করার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা ছবিতে। এক এক সময় দীপের ইচ্ছে করে বাপ্পার কান ধরে টেনে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় কষাতে। কিন্তু বন্ধুর ছেলেকে সে কোনও শাস্তি দেবার অধিকারী নয়।

ট্রেন ছাড়ার পরই বৃষ্টি নেমেছিল। এত বৃষ্টির তোড় যে চতুর্দিক যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। দীপ তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করে ঝাপসা গাছপালার ছবি তুলল কয়েকটা। যদি ঠিক ঠাক ওঠে, তাহলে এই সব ছবিতে ওয়াশ-এর এফেক্ট আসে। দীপ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ছবি পাঠায়।

বাপ্পা সরু চোখে ক্যামেরাটা দেখল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, আমায় দাও, আমি ছবি তুলব!

এই বিচ্ছুর হাতে দীপের শখের ক্যামেরা? অসম্ভব। দীপ গম্ভীর ভাবে বলল, বড়দের জিনিস, হাত দেয় না।

কিন্তু এই কথাটা বাপ্পা এতবার শুনেছে যে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। সে তবু বলতে লাগল, দাও, আমি ছবি তুলব, দাও!

জয়া জানে ক্যামেরা সম্পর্কে দীপের দুর্বলতা। নিজের ছেলেকে হাত দিতে দেয় না। সামলাবার জন্য সে বলল, তুমি বাপ্পার একটা ছবি তুলে দাও! বাপ্পা, তুমি মায়ের পাশে বসো!

টিপিক্যাল গ্রুপ ছবি তুলতে একেবারে পছন্দ করে না দীপ। আজকাল হট শট ক্যামেরা বেরিয়েছে কতরকম, অ্যাপারচার,

ফোকাসের ঝামেলা নেই, শাটার টিপে এই সব ছবি যে কেউ তুলতে পারে। তাছাড়া, এ ছেলে তো শান্ত হয়ে বসবে না। ঠিক মতন ফ্রেমিং না হলে সে ছবির কোনও মানে হয়?

তবু মনীশ-সোমা-বাপ্পার দু'তিনটি স্ন্যাপ নিল দীপ। তাতে বাপ্পা একটুও ভুলল না, আবার বলতে লাগল, ক্যামেরা আমায় দাও, আমি নিজে তুলব…। দীপের গায়ের ওপর উঠে এসে কেড়ে নেবার চেষ্টা করল ক্যামেরা।

দীপ তাড়াতাড়ি ক্যামেরাটা ভরে ফেলল ব্যাগের মধ্যে। ব্যাগটা তুলে দিল ওপরে।

এরপর বাপ্পা ছুটে ছুটে দূরে চলে যায়, সোমা তাকে ধরে আনে, বাপ্পা প্রত্যেকবার বলে, ও কেন আমায় ক্যামেরা দিল না? ঐ পাজিটা?

একবার বাপ্পাকে দেখাই গেল না। সোমা কান্না মিশ্রিত জ্বলন্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকাতেই মনীশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেখি? দেখছি! দেখছি! তোমার ছেলের প্রচুর বুদ্ধি, সে বাইরে ঝাঁপ দেবে না!

বাপ্পা চলে গেছে পাশের কামরায়। সেখান থেকে সে কিছুতেই আসবে না, জোর করে টেনে আনা হল। এসেই সে চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলল, ঐ লোকটা কেন আমায় ক্যামেরা দেবে না? আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব না!

যতই অন্য কিছু বলে ভোলাবার চেষ্টা করা হোক, ভবী ভোলবার নয়। ক্যামেরার কথা তার মাথায় গেঁথে গেছে। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তাকে চকোলেট কিনে দেওয়া হল, তাও সে ফেলে দিল দয়ে ।জানলা f

মনীশ এবার দীপকে বলল, ক্যামেরাটা একবার আমাকে দে তো!

বন্ধু চাইলে আপত্তি করা যায় না।

মনীশ ছেলেকে কোলে বসিয়ে নিজে ক্যামেরাটা ধরে রেখে বলল, এই তো, এবার ছবি তোলো। এই খানে টিপতে হবে।

বাপ্পা আগে ভিউ ফাইণ্ডারে চোখ লাগাল। কয়েক মুহূর্ত শুধু শান্ত হয়ে দেখল লেন্সের মধ্যে দিয়ে দেখা দৃশ্য। তারপরই জেগে উঠল স্বাধীনতা স্পৃহা। এক ঝটকায় নেবে গেল বাবার কোল থেকে। ক্যামেরাটাও ছিনিয়ে নিয়েছে। হি হি হি করে প্রাণ খোলা আনন্দে হাসতে হাসতে দৌড় লাগাল।

শিশুদের হাসি কত সুন্দর হয়, কিন্তু দীপের মনে হল ঐ শব্দ যেন বিচ্ছুটির চাবুক।

শুধু হাত থেকে পড়ে গেলে তত ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ছুটন্ত অবস্থায় পড়ল বলেই বেশ জোরে শব্দ হল। ততক্ষণে মনীশ আর দীপ দু'জনেই দৌড়ে এসেছে, দীপই আগে তুলে নিল।

বাপ্পা এতক্ষণে একটু ভয় পেয়েছে। মিনমিনে গলায় বলল। ভাঙেনি, ভাঙেনি।

মনীশও বলল, দেখি, দেখি, ভাঙেনি, তাই না? যাক বাবা, কিছু ক্ষতি হয়নি!

ভাঙেনি, ফাটেনি, লেন্স-এরও কোনও ক্ষতি হয়নি, কিন্তু শাটার লক্‌ড হয়ে গেছে। টেপাটেপি করলেও ভেতরটা অনড়।

মনীশ বলল, ওটা ঠিক করা যাবে। আমার চেনা খুব ভালো দোকান আছে। তুই কিছু চিন্তা করিস না, দীপ। আমি সারিয়ে দেব!

দীপ শুকনো ভাবে হাসল। তার ভেতরটা রাগে জ্বলে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে বাপ্পাকে টেনে দুটো লাথি কষাতে। কিন্তু জয়া তার চোখের দিকে চেয়ে আছে, জয়া মিনতি করছে তাকে ভদ্রতা রক্ষা করতে।

মনীশ ইঙ্গিত করল যে সারাবার খরচ সে দিয়ে দেবে। কিন্তু খরচের ব্যাপারটা যে কিছুই না, তা মনীশ বুঝবে না। ঠিক এই

রকম আর একটা নতুন ক্যামেরা কিনলেও দীপের দুঃখ ঘুচবে না। এক একটা ক্যামেরায় এমন হাত সেট করে যায় যে সেই ক্যামেরা ও তার মালিক যেন পরস্পরের ভাষা বোঝে। সেই ক্যামেরা অন্যের হাতে গেলে অভিমান করে। এখন সেই রকমই কোনও প্রবল অভিমানে ক্যামেরাটা শাটার বন্ধ করে আছে।

সোমা বাপ্পাকে জোর ধমক দিয়ে বলল, বারণ করেছিলাম, তবু ক্যামেরাটা নিয়ে···কাকু এবার রাগ করবেন।

মনীশ বলল, আচ্ছা, ওকে বকছ কেন, ও কি কিছু বোঝে!

মনটা বিস্বাদ হয়ে গেছে দীপের, তবু কোনক্রমে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, ঠিক আছে, এ নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না!

ঘাটশিলায় পৌঁছে গেল ট্রেন। আজকাল স্টেশনে অটো রিক্সা, দু'একটা ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। কিন্তু ওরা দুটো টাঙ্গা ভাড়া করল। স্মৃতির গলিপথ দিয়ে ফিরে যাওয়া। বহু বছর আগে, প্রায় বাচ্চা বয়েসে মনীশ আর দীপ ওদের বাবা-মায়েদের সঙ্গে যখন প্রথম ঘাটশিলায় এসেছিল, তখন টাঙ্গায় চেপেছিল জীবনে প্রথমবার। বাপ্পারও সেই রকম একটা স্মৃতি থাকবে। এখন দীপদের একটা বাড়ি আছে এখানে। মনীশ বহুকাল এদিকে আসেনি।

দীপ আর জয়া মনীশদের নেমন্তন্ন করে এনেছে। সুতরাং ওদের ছেলে যতই দুষ্টুমি করুক, বাগানের গাছ নষ্ট করুক, রান্নাঘরে প্লেট ভাঙুক, তবু খাতির যত্ন করতেই হবে। দীপ বাজারে গিয়ে একগাদা মাছ আর আনাজ কিনে আনে, জয়া তিনখানা রান্নার বই এনেছে। সব রকম এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছে এখানে। সোমার ইচ্ছে থাকলেও জয়াকে রান্নায় সাহায্য করতে পারে না, ছেলেকে সামলাতেই সে সর্বক্ষণ ব্যস্ত। বাগান পেরিয়ে বাপ্পা পেছনের মাঠে চলে যায়, সোমাকে ছুটতে হয় পেছন পেছন।

মনীশ বারান্দায় বসে পা নাচায়। সে বলেই দিয়েছে, সে শুধু আলস্য করতে এসেছে এখানে, কোনও রকম কাজকর্মের মধ্যে নেই।

বাপ্পার দুষ্টুমি ও সোমার নাজেহাল হওয়া সে উপভোগ করে। ছেলের বয়েসে সে নিজেও কম দস্যি ছিল না, উঃ তখন বাবার হাতে কী মার খেয়েছে। কলকাতার ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে হয়, এখানে এত খোলামেলা পেয়েছে, ছেলেটা যা খুশি করুক।

দীপের মনটা সবসময় খচখচ করে ক্যামেরাটার জন্য। জার্মানি থেকে পাঁচ বছর আগে কিনেছিল। কোনদিন একটুও গোলমাল করেনি। কিন্তু ক্যামেরা কি আছাড় মেরে ফেলার জিনিস?

এখানে এত আলো যে সব দরজা-জানলা বন্ধ করলেও ঘরটা পুরো অন্ধকার হয় না। তাছাড়া ঘুলঘুলি আছে। দীপ একবার ক্যামেরাটা খুলে ফেলল। ভেতরে আদ্ধেকটা ফিল্‌ম এক্সপোজড হয়ে আছে, সব ফগি হয়ে যাবে। তা যাক, তবু ক্যামেরাটার কী গণ্ডগোল, তা না জেনে দীপের স্বস্তি হচ্ছে না। এই সব ক্যামেরা একবার সারাতে দিলে আর কখনও আগের মতন হয় না। একে-বারেই বারোটা বেজে গেল কিনা, তাইই বা কে জানে।

দীপ ক্যামেরাটাকে আদর করে, ফিসফিস করে কথা বলে।

একদিন পর ক্যামেরাটার মতি একটু বদলাল। শাটার রিলিজ হয়ে গেল বটে, কিন্তু ফিল্‌ম সরে না। অটোমেটিক ওয়াণ্ডিং, হাত দিয়ে ঘোরানো ফেরানোর ব্যাপার নেই, কিন্তু শাটার পড়ছে, ফিল্‌ম সরছে না। এ আবার কী নতুন উপসর্গ!

দীপ বারবার শাটার টেপে, তবু আর কোনও পরিবর্তন ঘটল না।

সারা বছর এ বাড়ি প্রায় খালিই পড়ে থাকে। ন'মাসে ছ'মাসে আসে দীপ আর জয়া। ওদের ছেলে দার্জিলিং-এ পড়ছে, ছুটির সময় সে কলকাতায় আসে বটে কিন্তু তখন তাকে ঘাটশিলায় আনা বাবা-মায়ের অসাধ্য। কলকাতায় তার কত বন্ধু।

এ বাড়ির কুয়োর জল খুব মিষ্টি, কাছাকাছি অঞ্চলে দীপদের কুয়োটি প্রসিদ্ধ। পাশেই রয়েছে সাঁওতালদের একটি বসতি, তারা অনেকেই এ বাড়ির কুয়ো থেকে জল নিতে আসে। দীপ তার

কেয়ারটেকারকে বলে রেখেছে, জল নিতে এলে কারুকে বারণ করবে না। এমনকি পাড়ার বাচ্চারা এসে বাগানের ফল-পাকুড় খেলেও আপত্তি নেই, আর কে-ই বা খাবে!

বাইরের অনেক লোকজন আসে যায়, মনীশ বারান্দায় বসে তাদের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বলে। লোকজনের সঙ্গে ভাব জমাতে সে ভালোবাসে।

দুপুরবেলা বাপ্পাকে জোরজার করে ঘুম পাড়ানো হয়। তখন চারজনে আড্ডা জমে। একমাত্র ঘুমেই বাচ্চারা জব্দ। একটি মাত্র সাড়ে ছ'বছরের বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়লে সারা বাড়ি একেবারে শান্ত হয়ে যায়। সোমার মুখে স্বাভাবিক ভাব ফিরে আসে।

বিকেল হয়ে এসেছে। রোদ্দুরের রং এখন কিছুটা হলুদ মেশানো। বাগানের দিকের বড় বারান্দাটায় বসে ওরা চা খাচ্ছে। দীপ শুধু নেমে গিয়ে টেপাটিপি করছে ক্যামেরাটা। ফিলমটা ঘুরছে না কেন? অথচ মনে হয় যেন যে কোনও মুহূর্তে ঠিক হয়ে যাবে। যদিও ভেতরের পুরো রিলটাই আলো লেগে খারাপ হয়ে যাবার কথা, তবু ঘুরুক, ঘুরুক অন্তত। ভেতরে একটা শব্দও হচ্ছে, কিন্তু নম্বর পাল্টাচ্ছে না।

এক খুনখুনে বুড়ি এ বাড়ির কুয়ো থেকে সারা দিনে তিন চার কলসি জল নিয়ে যায়। সেই বুড়িটি ভরা কলসি কাঁখে নিয়ে দাঁড়াল দীপের পাশে। এক সময় সে বলে উঠল, ও বাবা, তুমি ঐ কুকুরটার ছবি তুললে?

বাগানের এক কোণে একটা কুকুর শুয়ে আছে। দীপ লক্ষ্য করেনি। সে কোন উত্তর দিল না।

বুড়িটা আবার বলল, তোমার ওতে কুকুরের ছবি ওঠে, আমার উঠবে না?

দীপ এবারও কোন উত্তর দিল না।

বুড়ি এবার আরও কাছে এসে এক মহাসাগর ভরা মিনতির সুরে

বলল, ও বাবা, আমার একখান ছবি তুলে দেবে? একখান ছবি? কেউ কোনদিন তোলেনি!

গলার স্বরের সেই আকুলতায় চমকে উঠল দীপ।

অসহায় ভাবে সে বারান্দার অন্যদের দিকে তাকাল।

এখন বুড়িকে কী বলবে দীপ। ভদ্রলোক হওয়ার অনেক ঝামেলা আছে। ক্যামেরাটা খারাপ বললে কেউ বিশ্বাস করবে? কলকাতার বাবুরা এসে বাগানের ছবি তোলে, এমনকি একটা কুকুরেরও ছবি তোলে, অথচ পাশের পল্লীর এক বুড়ির ছবি তোলে না। এরমধ্যে বাঙালি-বিহারীর প্রশ্নও এসে যেতে পারে। বুড়ি খুব সম্ভবত সাঁওতাল, তা হলে আসবে ঝাড়খণ্ডি সমস্যা। আদিবাসীদের উপেক্ষা করছে বহিরাগত উটকোবাবুরা।

বুড়ি আবার লজ্জা লজ্জা ভাব করে বলল, আমি কবে মরে যাব, আমার ছেলেরা দেখবে, মনে রাখবে।

দীপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, ঠিক আছে, এই দিকটায় এসে দাঁড়াও, ছায়া থেকে সরে এসো।

বুড়ি একটা আতা গাছের পাশে এসে বলল, এইখানটায়?

ওখানে দাঁড়ালে মুখের এক পাশে স্যাডো পড়বে, তাতে কী আসে যায়। ফিল্ম নষ্ট, ক্যামেরা নষ্ট, সবই তো অভিনয়।

মনীশ, জয়ারা মজা পেয়ে গেছে। মনীশ বলল, ও বুড়িমা, হাসো, হাসো, গম্ভীর হয়ে আছো কেন?

সোমা বলল, কলসিটা নামিয়ে রাখো। শরীরের এক দিকটা বেঁকে গেছে যে!

দীপ শাটার টিপে বলল, হয়ে গেছে।

বুড়ি কলসিটা মাটিতে নামিয়ে আবদারের সুরে বলল, আর একখান? এইভাবে?

জয়া বলে উঠল, একটু পাউডার মাখিয়ে দেব নাকি?

খচখচ করে তিন চারবার শাটার টিপল দীপ। ফিল্ম এখনও

সরছে না। সব ব্যাপারটাই মিথ্যে।

বুড়ির মুখে অদ্ভুত এক আনন্দ, লজ্জা আর সার্থকতার হাসি ফুটে আছে। কলসিটা আবার তুলে নিয়ে বলল, আবার যখন আসবে, তখন দিও।

জয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ওমা, বাবাকে একটু মনে করিয়ে দিও।

গেট পেরিয়ে চলে গেল বুড়ি। ছবি তোলা হয়েছে, এটাই বড় কথা, কবে তা পাবে, তার জন্য কোনও ব্যস্ততা নেই।

এমনিতেই আসা হয় না, তাছাড়া আগামী সপ্তাহে দীপকে অফিসের কাজের ট্রেনিং নিতে বম্বে যেতে হবে। থাকতে হবে অন্তত সাত-আট মাস। খানিকটা অপরাধ বোধে ভুগতে লাগল দীপ, অথচ যে অপরাধের জন্য সে দায়ী নয়। ক্যামেরাটা ভাল থাকলে কি সে বুড়ির অনুরোধে কয়েকখানা ছবি তুলে দিত না? এ বাড়ির মালির কাছে পোস্টে পাঠিয়ে দিত।

পরদিনই কলকাতায় ফেরা।

মনীশের সাহায্য নেবার কোনও দরকার হল না। দীপের নিজেরই নির্দিষ্ট একটা দোকান আছে। মালিকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সেই মালিক ক্যামেরাটা হাতে নিয়েই বলল, নিশ্চয়ই কেউ মাটিতে ফেলে দিয়েছিল?

ফিল্মের রোলটা ডেভেলপ করতে গিয়ে দেখা গেল, একটা মিরাকল ঘটে গেছে। প্রথম দিকের সবকটা ছবি নষ্ট। বৃষ্টির ছবি, ট্রেনের কামরার ছবি কিছু নেই। কিন্তু শেষ দিন বাগানে দীপ এমনি এমনি যে সব শাটার টিপেছিল, সেই সব ছবিই উঠেছে। বাগানের গাছপালা, মাঠ, কুকুর, বাড়ির দেওয়াল, আর সবচেয়ে ভাল উঠেছে বুড়ির ছবি। তারমধ্যে একটা স্ন্যাপ তো প্রতিযোগিতায় পাঠাবার মতন, মুখের একদিকে ছায়া, একদিকে আলো। মাথার ওপর আতা গাছের কয়েকটা পাতা, এমন ভাল ছবি দীপ নিজেও খুব

কম তুলেছে। আর দু'তিনটি ছবিতে বুড়ির মুখ সমস্ত ভাঁজ-টাজ ও সলজ্জ হাসি নিয়ে স্পষ্ট। বাঁধিয়ে রাখার মতন।

দোকানের মালিক ক্যামেরাটায় নতুন একটা রিল ভরে দু'বার শাটার টিপল। তারপর বলল, আপনার ক্যামেরাটা নিজে নিজেই ভাল হয়ে গেছে। আমায় কিছু করতে হল না। অথচ লক হয়ে গিয়েছিল তো বটে। আশ্চর্য ব্যাপার!

দীপ অবাক হল না। ক্যামেরাটার সঙ্গে তার যে একটা পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্ক আছে, তা তো অন্য কেউ জানে না।

ক্যামেরার ব্যাপারে দীপের খানিকটা কুসংস্কারও আছে। তার ধারণা হল, একটা বাচ্চা ছেলের হাতে দেওয়া হয়েছিল বলেই ক্যামেরাটা অভিমান করেছিল। আবার বুড়ির ছবি তোলার সময় দীপের মান বাঁচাবার জন্যই ক্যামেরাটা আবার সচল হয়েছে।

ছবিগুলো ফুল সাইজ এনলার্জ করালো দীপ। আলো-ছায়ার ছবিটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দীপ। নিজের সৃষ্টিতে নিজেই সে মুগ্ধ। এর আগে কোনও বুড়ি-টুড়ির ছবি তোলেনি সে। এই ছবিটি নির্ঘাৎ প্রাইজ পাবে। বুড়ির মুখের এক্সপ্রেশান একেবারে নিখুঁত।

অফিসের কাজে বম্বে যাওয়াটা পিছিয়ে গেছে দিন-পনেরো, হাতে কিছু সময় পাওয়া গেছে। দীপ জয়াকে বলল, চলো, আর একবার ঘাটশিলা ঘুরে আসবে নাকি?

জয়া চমকে উঠে বলল, এর মধ্যেই আবার?

দীপ বলল, মনীশের ছেলেটার জন্য তো এক মুহূর্ত শান্তি পাওয়া যায়নি। এবার চলো, কয়েকটা দিন নিরিবিলি কাটিয়ে আসি।

বুড়িকে নিজের হাতে ছবিগুলো দেবার জন্যই যে দীপ যেতে চায়, তা নিজের স্ত্রীকে বলতেও লজ্জা পাচ্ছে। এটা আদিখ্যেতার মতন শোনাবে। পোস্টে ছবিগুলো পাঠাতে তো কোনও

অসুবিধে নেই।

জয়া যেতে রাজি নয়। বম্বে যাবার আগে তার অনেক গোছ-গাছ আছে। সময় যখন পাওয়া গেছে, সে বহরমপুরে বাপের বাড়িতেও একবার ঘুরে আসতে চায়।

দীপ বলল, তুমি যে বাগানে কিছু গাছ লাগাবে বলেছিলে, আমি তবে সেই ব্যবস্থাটা করে আসি। এরপর বেশি বর্ষা নেমে গেলে আর গাছ লাগানো যাবে না। আমরাও আর সাত-আট মাসের মধ্যে যেতে পারব কি না সন্দেহ। ততদিনে গাছগুলো বড় হোক।

একাই চলে এল দীপ।

কেয়ার টেকার বুধন বেশ বিব্রত হয়ে পড়ল। মাঠে ধান রোওয়া শুরু হয়েছে, সে এই সময়ে সেই কাজ করে কিছু উপরি রোজগার করে। এই সময়টায় সব বেকাররাও মাঠের কাজ পায়।

সারাদিনে বুড়ির দেখা পাওয়া গেল না একবারও। বাগানের কাজ করতে করতে দীপ জিজ্ঞেস করল, ঐ যে একটা খুব বুড়ি জল নিতে আসত···

বুধন বলল, সাঁওতালপাড়ার বুড়িটা তো? যার আপনি ছবি তুলেছিলেন? তার তো খুব অসুখ শুনেছি। খুব বৃষ্টিতে ভিজেছিল।

এরকম একটা সম্ভাবনা দীপের মনের মধ্যেও উঁকি মেরেছিল। যেমন খুনখুনে বুড়ি, বেশি দেরি হলে মরেও যেতে পারে। অত জল ভর্তি ভারি কলসি বইত। ক'দিন ধরে বৃষ্টিও হল খুব।

দীপ বলল, চল তো, তাকে দেখে আসি।

ঠিক যে বুড়ির টানেই যাচ্ছে তা নয়। দীপের এখনও ধারণা, বুড়ির জন্যই তার ক্যামেরাটা ভাল হয়ে গেছে।

বাড়িটা কেনা হয়েছে বারো বছর, এরমধ্যে দীপ কক্ষণো সাঁওতাল-পাড়ায় কারুর বাড়িতে যায়নি। কারুর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। জয়া তবু অনেককে চেনে।

উঠোনে গড়াগড়ি যাচ্ছে এক গাদা বাচ্চা, একজন ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছিল, তাকে ধপাস ধপাস করে মারল তার মা। ঘুরে বেড়াচ্ছে

কয়েকটা মুরগি, একটা কুকুর কী চিবোচ্ছে কে জানে। কোদাল আর একটা ঝুড়ি নিয়ে একটা ঝুপড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল এক মাঝবয়েসী পুরুষ।

বুধন তাকে জিজ্ঞেস করল, এই তোর মা কোথায় রে?

সে লোকটি বুধনের বদলে দীপকে দেখল আপাদমস্তক। মুখে একটা অপ্রসন্নভাব। বুধনকে সে জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

বুধন বলল, তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আমাদের বাবু।

ভাব-ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় লোকটির কাজে যাবার জন্য খুব ব্যস্ততা। দিনের রোজগারটাই আসল কথা, বাজে কথা বলার সময় নেই।

সে সংক্ষেপে বলল, হাসপাতালে।

তারপর হন হন করে এগিয়ে গেল।

বুধন দীপকে বুঝিয়ে দিল, বাঁচবে না বোধহয়, তাই হাসপাতালে দিয়ে এসেছে।

একবার দীপ ভাবল, হাসপাতালটা কোথায় জেনে নিয়ে সে সেখানেই যাবে বুড়িকে ছবিগুলো দিয়ে আসতে।

পরের মুহূর্তেই বুঝতে পারল, তা হয় না। এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। এক সাঁওতাল বুড়ির সঙ্গে দেখা করতে সে যাবে হাস-পাতালে? অনেকে বিস্মিত ভুরু তুলে তাকেই দেখাবে। নাঃ, এটা তাকে মানায় না। সভ্যতার অঙ্গ হচ্ছে ভাবালুতা গোপন করা। হাসপাতালে বুড়িটা যদি তার চোখের সামনেই মারা যায়?

বুড়ির ছেলেকে ডেকে সে বলল, শোনো, তোমার মায়ের ক'খানা ছবি তুলেছিলাম, তুমি রেখে দাও—

লোকটি ফিরে এসে ছবিগুলো হাতে নিল। দেখল। তার শরীরে একটা অস্থিরতা। আকাশের দিকে তাকাল একবার। তার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

একটাও শব্দ উচ্চারণ করল না সে। ঘরের দাওয়ার ভেতরের দিকের চালে ছবিগুলো গুঁজে রেখে সে দৌড় দিল মাঠের দিকে।

চেয়ার

আগাগোড়া শ্বেতপাথরে বাঁধানো বিশাল চওড়া সিঁড়ি। দুধের মতন সাদা, কোথাও এক ছিটে ধুলো নেই। এক পাশের রেলিংটা মনে হয় যেন সোনা দিয়ে তৈরি। এককালে যেসব ছিল রাজা-রানীদের বাড়ি, এখন সেগুলিই মিউজিয়াম।

সিঁড়ির মুখে এসে অমিত জিজ্ঞেস করলো, মা, তুমি এতখানি সিঁড়ি উঠতে পারবে?

হৈমন্তী মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, পারবো।

অমিত আবার বললো, তোমার পায়ে ব্যথা।

হৈমন্তী বললেন, না, না, ব্যথা নেই, আজ ব্যথা নেই!

রাজা-রানীদের নিশ্চয়ই শরীরে বেশ জোর থাকতো। রোজ এতটা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা-নামা, তারপর বারান্দাগুলো কী দারুণ লম্বা, কত যে ঘর তার ইয়ত্তা নেই। রাজা-রানীরা এত হাঁটতে পারতেন? বাড়ির মধ্যে তো আর পালকি চড়া যায় না!

অমিত বললো, মা, আস্তে আস্তে ওঠো!

হাঁটুতে জোর কমে গেছে, ইদানীং সিঁড়ি ভাঙতে হৈমন্তীর বেশ কষ্ট হয়। সিঁড়ি ভাঙার অভ্যেসটাও চলে গেছে। এদেশে তাঁর ছেলের বাড়িটা দোতলা। হৈমন্তী একতলার একটি ঘরে থাকেন। রেল স্টেশানে কিংবা বিমানবন্দরে এমনকি বড় বড় দোকানেও এসকেলেটর থাকে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় না।

দু হাঁটুই বেশ টনটন করছে, তিনতলা পর্যন্ত উঠতে বুকে চাপ লাগছে, তবু হৈমন্তী মুখে কিছুই স্বীকার করবেন না। ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে রেখেছেন। কষ্ট হচ্ছে বলে কি এত সব ভালো ভালো জিনিস দেখবেন না? দিনের পর দিন তো বাড়িতেই বসে থাকতে হয়। এসব দেশে এই এক জ্বালা! নিজে নিজে বাড়ি থেকে বেরুনো

যায় না। কলকাতায় থাকতে হৈমন্তী একা একা ট্রামে-বাসে চলাফেরা করতেন। এখানে কেউ সঙ্গে নিয়ে না গেলে কোথাও যাবার উপায় নেই। সব কিছুই দূর দূর। গাড়ি ছাড়া যাওয়া যায় না। হৈমন্তী ফরাসী ভাষাও জানেন না। একা চলাফেরা করতে ভয় হয়। ছেলে আর ছেলের বউ দু'জনেই চাকরি করে, সারা সপ্তাহ খুব ব্যস্ত, আর ছুটির দিনে ক্লান্ত হয়ে থাকে।

সবাই জানে, হৈমন্তী এখন ফরাসী দেশে আছেন ছেলের বাড়িতে। কিন্তু আসলে তো থাকেন প্রায় বন্দী অবস্থায় একটা বাড়ির মধ্যে, সে বাড়িও শহর থেকে বেশ দূরে। এইভাবেই কেটে যায় মাসের পর মাস।

ভাগ্যিস অমিতের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এসেছে কলকাতা থেকে। তাই অমিত তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। অন্য সময় অমিত যখন বন্ধুদের বাড়িতে পার্টিতে যায়, তখন হৈমন্তীকে দু'একবার অনুরোধ করলেও তিনি সঙ্গে যেতে চাননি। অল্পবয়েসী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তিনি কী করবেন? ওদেরই অস্বস্তি হবে।

আজ হৈমন্তী নিজেই ছেলেকে বলেছেন, তোরা মিউজিয়াম দেখতে যাচ্ছিস, আমাকে সঙ্গে নিবি?

অমিতের বন্ধু সত্যেশ ছবি ভালোবাসে, ইতিহাস ভালোবাসে। একতলা, দোতলা ঘুরে ঘুরে সবাই চলে এলো তিনতলায়। কতরকম ছবি আর ভাস্কর্য। দোতলাটায় শুধু ইজিপশিয়ান শিল্প। হৈমন্তীর সবই দেখতে ভালো লাগছে। শুধু বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে এইসব মূল্যবান সব শিল্প দেখার আনন্দ কত বেশি। শরীরের কষ্ট হচ্ছে হোক। হৈমন্তীর পুত্রবধূ ফরাসী মেয়ে, সে অবশ্য আজ আসতে পারেনি, তার অফিস আছে। এলেন মেয়েটি খুবই ভালো, হৈমন্তীর যত্ন করে প্রাণ দিয়ে।

তিনতলায় সব আধুনিক কালের ছবি। এসব ছবি হৈমন্তী ঠিক বুঝতে পারেন না, তবু অমিত আর সত্যেশ কতরকম আলোচনা

করছে, তিনি শুনছেন।

এক সময় ওরা দু'জন খানিকটা দূরে সরে গেল। বোধহয় সিগারেট খাবে। ছেলেকে হৈমন্তী বলেই দিয়েছেন তাঁর সামনে সিগারেট খেতে, কিন্তু সন্তোশ লজ্জা পায়।

ওরা দু'জন আড়ালে যেতেই হৈমন্তীর শরীরটা একটু বিশ্রাম নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। শুধু দুই হাঁটু নয়, কোমরের নিচের সব অংশটা যেন অবশ হয়ে আসছে। একবার একটু না বসলেই নয়।

কিন্তু বসবেন কোথায়? একটার পর একটা ঘরে দেয়াল ভর্তি ছবি। কোনো কোনো ঘরে পুরনো আমলের সোনা-রুপোর জিনিসপত্র। অনেক জিনিসে যাতে হাত না দেওয়া হয়, সেইজন্য দড়ি দিয়ে ঘেরা।

ঘুরতে ঘুরতে হৈমন্তী হঠাৎ দেখতে পেলেন, এক জায়গায় একটা চেয়ার। ভেলভেট দিয়ে মোড়া চেয়ারটার হাতল দুটো সোনালি রঙের। অনেকটা যাত্রা দলের রাজা-রানীদের চেয়ারের মতন। এসব জায়গায় প্রত্যেক ঘরে একজন করে গার্ড থাকে। হৈমন্তী ভাবলেন, এটা কোনো গার্ডের চেয়ার। সে কোথাও উঠে গেছে। এখানে একবার বসা যায় না?

শরীর আর বইছে না। পা দুটো বিদ্রোহ করছে। একটু বসলে ক্ষতি কী?

হৈমন্তী আর দ্বিধা না করে বসে পড়লেন। চওড়া কালো পাড়ের শাড়ি পরা, সাদা ব্লাউজ, মাথার সিঁথি সাদা, চোখে নস্যি রঙের চশমা, হৈমন্তী সেই চেয়ারে বসে একটা আরামের নিশ্বাস ফেললেন।

পা দুটি শান্তি পেয়েছে। হৈমন্তী হাত দুটি চেয়ারের হাতলের ওপর রাখতেই একটা হাতল টুপ করে খসে পড়ে গেল।

এই সব দেশে কেউ জোরে কথা বলে না। মিউজিয়ামে ফিসফিস

করে কথা বলাই নিয়ম। ঘরের মধ্যে অন্য অনেক লোক ছিল, কোনো শব্দ ছিল না, চেয়ারের হাতলটা ভেঙে পড়ার একটা শব্দ হলো।

হৈমন্তী লজ্জা পেয়ে হাতলটা কুড়োতে যেতেই একজন গার্ড ছুটে এলো তাঁর সামনে। মধ্যবয়েসী লম্বা লোকটি কী যে বলতে লাগলো, হৈমন্তী কিছুই বুঝতে পারলেন না। লোকটি বেশ উত্তেজিত হয়েছে মনে হচ্ছে। হৈমন্তী ভাবলেন, চেয়ারটা যদি ভেঙেই গিয়ে থাকে, তাঁর ছেলে এসে সারাবার খরচ দিয়ে দেবে। তাঁর ছেলে ভালো চাকরি করে।

গার্ডের চেঁচামেচিতে হৈমন্তী কোনো সাড়া শব্দ করছেন না দেখে আরও দু'তিনজন এলো সেখানে। তার মধ্যে একজনের চেহারা মেয়ে পুলিশের মতন। সেই মহিলাটি হৈমন্তীর হাত ধরে টেনে তুললো।

হৈমন্তী ফরাসী ভাষা জানেন না বটে, কিন্তু মোটামুটি কাজ চালানো ইংরিজি জানেন। তিনি বললেন, কী হয়েছে? আমার ছেলে এখানে আছে, তাকে ডাকো।

পুলিশের মতন মহিলাটি সে কথায় কর্ণপাত করলো না। হৈমন্তীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল একটা ছোট ঘরে। তারপর তিন-চারজন নারী পুরুষ এসে তর্জন-গর্জন করতে লাগলো তাঁর ওপর।

কিছুই না বুঝতে পেরে হৈমন্তী ভয়ার্ত স্বরে বলতে লাগলেন, আমার ছেলে? আমার ছেলে?

একটুক্ষণের মধ্যেই অমিত আর সন্তোশ সেখানে এসে পৌঁছোলো অবশ্য। অমিত চোস্ত ফরাসী ভাষায় তর্ক শুরু করে দিল। ক্রমশ একটা ঝগড়া লাগার উপক্রম।

মিনিট পনেরো এই রকম বাদানুবাদ চলার পর অমিত এক সময় বললো, মা, ওঠো! চলো এবার।

বেশ রাগত স্বর। ঐ লোকগুলোর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে অমিতের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

মিউজিয়ামের বাইরে এসে হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলেন, ঐ লোকগুলো কী বলছিল রে?

অমিতের বদলে তার বন্ধু সন্তোশ হাসতে হাসতে বললো, মাসিমা, আপনি বেশ ঐ চেয়ারটাতে বসে পড়লেন?

হৈমন্তী বললেন, পায়ে ব্যথা করছিল। খালিই তো ছিল চেয়ারটা। তবে বিশ্বাস করো, হাতলটা আমি ভাঙিনি। লাগানো ছিল আলগা করে। আমি হাত রাখতেই মটাং করে ভেঙে গেল।

সন্তোশ হাসতে লাগলো।

হৈমন্তী আবার বললেন, একটা হাতল ভেঙে গেছে, তাতে অত রাগারাগি করার কী আছে? হাতলটা আগেই ভাঙা ছিল। সে যাই হোক, হাতলটা কি আমরা সারিয়ে দিতে পারতাম না?

এবার অমিত মায়ের দিকে ফিরে দারুণ ঝাঁঝালো গলায় বললো, ঐ চেয়ারটার দাম কত জানো? শুধু আমাকে না, আমার তিন পুরুষকে বিক্রি করলেও ওর দাম উঠবে না।

সব মাকেই মাঝে মাঝে ছেলের কাছে ধমক খেতে হয়। হৈমন্তী অবিশ্বাসের সুরে, হাসিমুখে বললেন, যাঃ কী বলছিস। ঐ রকম একটা ভাঙা চেয়ার, তার দাম···

অমিত একই রকম বদ মেজাজে বললো, ওটা কার চেয়ার জানো? মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর।

সন্তোশ বললো, মাসিমা, মেরি আঁতোয়ানেৎ ছিলেন—

তাকে বাধা দিয়ে হৈমন্তী বললেন, জানি। ফরাসী দেশের রানী। ফরাসী বিপ্লবের সময় তাঁকে মেরে ফেলা হয়।

ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে ভাবে, মায়েরা বুঝি কিছুই জানে না। হৈমন্তী কলেজ জীবনে ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের কথা পড়েছিলেন, এখনো মনে আছে সেসব কথা।

রাস্তা পার হয়ে পার্কিং লটের দিকে যেতে যেতে অমিত আবার বললো, ঐ চেয়ার ছোঁয়াই নিষেধ। ওখানে বসলে ফাইন হয়। আর হাতলটা ভেঙে ফেলার জন্য ওরা তোমাকে জেলে দেবে বলছিল।

সত্যেশ বললো, ওদেরও দোষ আছে। দড়ি দিয়ে ঘেরা থাকে, দড়িটা যে খুলে গেছে, তা ওরা খেয়াল করেনি কেন?

অমিত বললো, পাশেই তো বোর্ড লাগানো আছে।

গাড়িটা খুঁজে পেয়ে দরজা খুলতে খুলতে অমিত আবার বললো, আমরা একটুখানির জন্য বাইরে গেছি, তার মধ্যেই এমন একটা কাণ্ড করে ফেললে? মা, তোমাকে কতবার বলেছি, এসব দেশে যেখানে সেখানে হাত দিতে নেই।

এতক্ষণ বাদে অভিমান হলো হৈমন্তীর।

তিনি বললেন, ওরা আমাকে জেলে দিতে চেয়েছিল, ছাড়িয়ে আনলি কেন? ভালোই তো হতো। আমার কাছে সবই সমান।

বাড়িতে আসার পর পুত্রবধূ এলেন, সব শুনে চোখ কপালে তুললো।

সে বললো, আপনি কী করেছিলেন মা? এর আগে একজন লোকের দশ হাজার ফ্রাংক ফাইন হয়েছিল এজন্য।

হৈমন্তী আর কী বলবেন, মুখ নিচু করে রইলেন। এতক্ষণে তিনি গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছেন। এক সময় চলে গেলেন নিজের ঘরে।

এসব দেশে ঘটনা বৈচিত্র্য খুব কম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, একই রকম জীবন। কিন্তু এটা একটা বলার মতন রোমহর্ষক ঘটনা। এক বিধবা বাঙালী মহিলা আর একটু হলে ফরাসী দেশের জেলে চলে যাচ্ছিলেন। টেলিফোনে টেলিফোনে চেনাশুনো। সকলের কাছে ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলা দুটি দম্পতির নেমন্তন্ন এ বাড়িতে, সত্যেশেরও তারা

চেনা। অন্য দিন হৈমন্তী সকলের সঙ্গে এসে বসেন, ওরা তাঁর সামনেই মদ খায়, তিনি কিছুই মনে করেন না। এদেশে তো মদ খেয়ে কেউ মাতলামি করে না, অনেকটা চা-কফির মতনই ব্যাপার। আজ কিন্তু হৈমন্তী রয়ে গেলেন রান্নাঘরে। ওখানেও আজকের ঘটনাটাই আলোচনা হচ্ছে। মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর চেয়ার ভেঙে ফেলার জন্য অমিতের মায়ের নির্ঘাৎ জেল হতে পারতো, হয়নি যে সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। অমিত চোস্ত্ ফরাসী ভাষায় মিউজিয়ামের প্রহরীদের নিরস্ত করেছে। প্রহরীদের কী কী যুক্তিবাদে অমিত বিদ্ধ করেছে, তা সে বন্ধুদের শোনাতে লাগলো বারবার।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি হতে লাগলো।

দু'গেলাস মদ খাবার পর অমিতের মেজাজটা ভালো হয়ে গেছে। রান্নাঘরে বরফ নিতে এসে সে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, ওঃ আজ কী ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! ওদের ওপর চোটপাট করছিলাম বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভয়ে কাঁপছিলাম! সত্যি যদি তোমাকে জেলে দিত। মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর চেয়ার ভেঙে ফেলা, এটা একটু খবরের কাগজে বেরুবার মতন খবর।

হৈমন্তী মিনমিন করে বললেন, চেয়ারটা ভাঙা ছিল। আমি শুধু একটু হাত রেখেছি।

অমিত বললো, বোধহয় আঠা দিয়ে জুড়ে রেখেছিল। কিন্তু সে কে প্রমাণ করতে যাবে? ওরা বললো, ভেঙে গেছে। যাক গে, তুমি আর মন খারাপ করে থেকো না।

রাত্তিরবেলা হৈমন্তী এক সুন্দরী রমণীকে স্বপ্ন দেখলেন। মাথা ভর্তি সোনালি চুল, কিন্তু মুখখানা খুব বিষণ্ণ। মেয়েটি নিজের গলায় হাত বুলোচ্ছে আর হৈমন্তীকে কিছু যেন বলতে চাইছে। মুখখানা চেনা চেনা লাগছে।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মহিলাটি, সাদা রঙের পোশাক

পরা। মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে।

হৈমন্তী এবার দেখতে পেলেন তার গলায় একটা গোল দাগ, সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিউরে উঠলেন।

এ তো রানী মেরি আঁতোয়ানেৎ!

ফরাসী বিপ্লবের সময় এঁর গিলোটিনে প্রাণ গিয়েছিল। অর্থাৎ গলাটা কেটে ফেলা হয়েছিল। সেই মেরি আঁতোয়ানেৎ স্বপ্নে দেখা দিলেন কেন? হৈমন্তী আজ তাঁর চেয়ারে বসে পড়েছিলেন বলে রেগে গেছেন? রাজা-রানীদের চেয়ারে তাঁর মতন সাধারণ মানুষদের বসতে নেই।

মেরি আঁতোয়ানেৎ যেন হৈমন্তীর মনের কথা বুঝতে পারলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন খুব জোরে। যেন বলতে চাইছেন, না, না, না, না···

হৈমন্তী বললেন, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি ভুল করে বসে ফেলেছি···

মেরি আঁতোয়ানেৎ কিছু বলতে গেলেন, বোঝা গেল না। আর তাঁকে দেখাও গেল না। এই সময় হৈমন্তী শুনতে পেলেন নিচের দরজায় কলিং বেল বাজছে।

বেলটা বেজেই চললো, কেউ খুলছে না। অমিতরা অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে এখন গভীর ঘুমে মগ্ন। সহজে জাগবে না।

হৈমন্তী নিজেই বেরিয়ে এলেন। এসব দেশে গভীর রাতে কিংবা শেষ রাতে অতিথি আসা আশ্চর্যের কিছু নয়। মাঝরাতে প্লেন আসে। দেশ থেকে হঠাৎ কেউ এসে পড়তে পারে।

দরজা খুলতেই দেখলেন একজন সাহেব দাঁড়িয়ে আছে।

নীল রঙের একটা লম্বা কোট পরা, বুকে একটা হাত, মাথায় সামান্য টাক। বাইরে আবছা অন্ধকার বলে মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না।

সাহেবটি অনেকটা ঝুঁকে হৈমন্তীকে অভিবাদন জানালো।

তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলো, তুমি হৈমন্তী দেবী?

হৈমন্তী বিহ্বলভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, দাঁড়ান, আমার ছেলেকে ডেকে দিচ্ছি।

সাহেবটি হাত তুলে বললো, কোনো দরকার নেই।

তারপর পেছন ফিরে মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলো।

একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘোড়ার গাড়ি। সেখান থেকে দুটো লোক নেমে, ধরাধরি করে নিয়ে এলো একটা চেয়ার।

হৈমন্তীর রক্ত হিম হয়ে গেল। এই তো সেই চেয়ারটা। ওরা এখনো ছাড়েনি? এই চেয়ারের দাম দিতে হবে নাকি? এত রাত্তিরে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে। তাঁর ছেলে অত টাকা পাবে কোথায়?

নীল কোট পরা সাহেবটি বাড়ির সামনের ছোট্ট বাগানে চেয়ারটা নামিয়ে রাখতে বললো।

হৈমন্তী ব্যাকুলভাবে বললেন, বিশ্বাস করুন, মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর চেয়ারটা আমি ভাঙিনি। ভাঙাই ছিল। আমি শুধু ভুল করে বসেছিলাম। সেজন্য আমাকে জেলে দিতে চান নিয়ে চলুন, আমার ছেলেকে কিছু বলবেন না।

নীল কোট পরা সাহেবটি উগ্র স্বরে বললো, কে বলেছে, এটা মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর চেয়ার? ওরা কিচ্ছু জানে না। এটা আমার চেয়ার ছিল। আমি এই চেয়ারে বসে জুতো পরতাম।

সাহেবটি চেয়ারে বসে পড়ে একবার দু'পা তুললো। আবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমার চেয়ার। আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুমি এই চেয়ারে যত খুশি বসতে পারো। বসো, এখন বসে ভাখো।

হৈমন্তী বললেন, না, না, আমি আর বসতে চাই না।

সাহেবটি বললো, আমি বলছি, তুমি বসো। তোমার জন্যই আমি নিয়ে এসেছি।

হৈমন্তী বললেন, এটা আপনার চেয়ার? তবে যে ওরা বললো ···আপনার নাম কী?

সাহেবটি হাসলো, হৈমন্তীর দিকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে বললো, আমাকে নিজের মুখে নাম বলতে হবে? আজকাল লোকে বুঝি আমায় ভুলে গেছে?

এবার হৈমন্তী চিনতে পারলেন। ছবিতে দেখেছেন বহুবার। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

নির্মাণ-খেলা

মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে অমল। কে যেন অমলকে ডাকছে। সারা রাত গুমোট ছিল, এখন সরু সরু বৃষ্টি ওড়াউড়ি করছে সকাল পৌনে সাতটার আকাশে। শুকনো মাটি থেকে বেরিয়ে আসছে ছোট ছোট জিভ, কিন্তু আগে বাতাস তৃষ্ণা মেটাবে, তারপর তো মাটি।

অমলের খালি পা, তার সাড়ে ন'খানা আঙুল। যেন কোনো মাটির মূর্তিতে পুরোহিতের মাথার গুঁতো লেগে ভেঙে গেছে একটা আঙুলের খানিকটা, প্রায় সেরকম। বাঁ পায়ের ঠিক মাঝখানের ভাঙা মাটির আঙুলটায় এখন কোনো ব্যথা নেই।

মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে অমল। কে যেন অমলকে ডাকছে।

অমল দৌড়ে যাচ্ছে না, দৌড়ে আসছে। পিঠ দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে তার মুখ ও বুক। তার নীল রঙের আধ-হাতা জামায় একটা মাত্র বোতাম আটকানো। জামাটা মাছ-চাষের পুকুরের জলের মতন নীল। অমলের মাথা ভর্তি চুল, মুখে সোওয়া তিন দিনের দাড়ি। তার চোখ থেকে মিহি রেণুর মতন উড়ে যাচ্ছে ঘুম। খানিকটা ঘুম সে বিছানায় ফেলে এসেছে, খানিকটা ছড়িয়ে দিচ্ছে মাঠে।

তার মুখ ও চোখের বয়েস সাতাশ। সাতাশ বছরে কত ঘর-বাড়ি পুরোনো হয়ে যায়, কত সজ্ঞ ভেঙে যায়, কত পৃষ্ঠা মলিন হয়ে যায়। কিন্তু সাতাশ বছরে মানুষের মুখ সবচেয়ে টাটকা, যেন সদ্য ফুটে ওঠা, যেন এই মাত্র মঞ্চে সে এলো। এর আগে সে মানুষ ছিল না। সে ছিল একটা বাচ্চা, কিংবা একটা সাধারণ কিশোর

কিংবা একটা কাজ-না-পাওয়া বেকার ছেলে, কিন্তু এখন সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ। যে-কোনো একজন দেবতা বা দানবের পাশে দাঁড় করালেও তাকে ঠিক মানুষ বলে চেনা যাবে।

ডাক শুনতে পাচ্ছে অমল, তার পায়ের গতি বাড়ছে।

পেছনের দিকে যে লোকালয়, তা এখন দেখা যাচ্ছে না। আধা-গ্রাম, আধা-শহর। অমলদের বাড়িতে একটা জামরুল গাছ আছে। এই সময় জামরুল ফুল থেকে পাপড়ি খসে খসে পড়ে।

সেরকমই কি একটা পাপড়ি লেগে আছে তার বুকে? না, পাপড়ি তো নয়, একটুখানি তুলো।

অমল যে-ঘরে শোয়, তার একটা জানলার ধারে তার বিছানা। বেশ পরিপাটি বিছানা, মসৃণ চাদর, অমলের একলার বিছানা। কিন্তু কবে যেন মাথার বালিশে একটু ফুটো হয়ে গেছে, সেখান থেকে তুলো বেরোয়। ছোট এক বিন্দু তুলো তো নয়, অমল তার বিছানাটাকেই গায়ে জড়িয়ে নিয়ে এসেছে। মানুষ সবচেয়ে ভালোবাসে তার নিজস্ব বিছানা। যেখানেই যাক, বিছানা তাকে ডাকে। দারুণ বিপদের মধ্যেও শুধু বিছানার জন্যই বেঁচে থাকার লড়াই করতে প্রেরণা পাওয়া যায়। বালিশে মাথা দিয়ে চোখ জুড়িয়ে এলে সমস্ত মানুষ সমান। ঘুমের মধ্যেই প্রকৃত সাম্য।

ছুটন্ত অমলের বুকে লেগে আছে এক বিন্দু তুলো, তার বিছানা।

বিছানার চাদরটা মাঝে মাঝে বড় পিসিমা কেচে দেয়, আবার অনেকদিন বদলানোও হয় না। মা নেই, তাই বাড়ি ভর্তি এত কাজ, পিসিমার স্নায়ুর জোর কমেছে, চোপা বেড়েছে। পিসিমার সংসার, কিন্তু বাবার টাকা। বাবা কি কোনো দিন, কোনো কালে এক শিশু অমলকে আদর করতেন? কৈশোর ছাড়াবার পর চোখাচোখি হলেই চোখ ফিরিয়ে নেওয়া। বাবা এ দরজা, অমল অন্য দরজা। বাবা খেতে বসলে অমল স্নান করতে যায়। বাড়িতে

আত্মীয়স্বজন যখন আসে, অমল নেই।

মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে অমল। কে যেন অমলকে ডাকছে।

মাঠে ঘাস নেই। কোমল লতা-গুল্ম নেই, মাঝে মাঝে দু'একটা খেজুর গাছ! বুনো খেজুর ফলে, বিচি সার। ছায়াও দেয় না। এখন অবশ্য সূর্য নরম। বুকে জড়িয়ে আদর করার মতন সূর্য। সামান্য বৃষ্টি মাখা, দিকবালিকার হাসির মতন রোদ।

চাষ হয় না, ঢেউ খেলানো ডাঙা জমি, মেঠো চলার পথের চিহ্ন রেখাও নেই। এখানে ওখানে শুকনো গোষ্পদ। কোথাও ঝুরঝুরু মাটির পাশে অজস্র উইপোকার ফিনফিনে ডানা। একটা অস্থায়ী উনুন ও পোড়া কাঠ, যারা এসেছিল তাদের অদৃশ্য প্রতিমূর্তি যেন এখনো বসে আছে গোল হয়ে। হাওয়ায় উড়ছে সিগারেটের প্যাকেটের রাংতা।

তারপরেই একটা এলোমেলো জলা! কোনোদিন এটা গভীর ছিল না, ভাসমান শ্যাওলা ফুলগুলো গভীরতার অর্থই জানে না। এই মাঠ কোনো নদীর নাম জানে না। কিন্তু কাছাকাছি দিগন্তে দেখা যায় বড় বড় গাছপালার সারি, তার মধ্যে অনেক ইঙ্গিত আছে, তাই অনেকেই এই মাঠ পেরিয়ে যায়।

জলার ওপর দিয়ে ছপছপ করতে করতে ছুটে যাচ্ছে অমল। তার ছাই রঙা প্যান্টালুন হাঁটুর কাছ পর্যন্ত গোটানো। জল ছিটকে উঠছে তার চেয়েও উঁচুতে। দুই উরুর খাঁকে। একটা মৃদু শিহরন।

তখনই সে তার বুকের তুলোর বিন্দুটিতে একটা গন্ধ পেল। অন্য মানুষের গন্ধ। এক প্রগলভা, এলোকেশিনী তরুণী, একদিনই মাত্র তার সঙ্গে এক বালিশে মাথা দিয়ে শুয়েছিল। তার মুখে পানের গন্ধ। খয়েরি লাল ঠোঁট। ইউক্যালিপটাস গাছের মতন গায়ের রং। চোখ দুটি ঠিক ভ্রমরের মতন নয়, ভ্রমরের উড়ে যাওয়ার

ভঙ্গির মতন। তার হাসি ছড়িয়ে যায় সারা শরীরে।

বড় স্পষ্ট তার শরীর। শরীর সর্বস্ব শরীর। গায়ের জামা, বুক ঢাকার জামা, শায়া, পেটিকোট কিছু পরে নি সে, শুধু একটা পাতলা গোলাপি শাড়ি সারা শরীরে জড়ানো। সেই আবরণ যেন নগ্নতার চেয়ে বেশি। তার স্তনবৃন্ত, নাভি, যোনিরোম পর্যন্ত অনুভব করা যায়। এরকম পোশাকের কোনো নারীকে অমল আগে দেখেনি। গ্রামেও দেখা যায় না। দরজা বন্ধ করার পর শোবার ঘরে নারীরা কী রকম থাকে, তা অমল জানে না। কিন্তু এই রমণী বাইরে থেকে এসেছিল, তার দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল হেমেন মজুমদারের আঁকা ছবির মতন, গোলাপি ও লাল রঙের আভায় হেসেছিল। কেঁপে উঠেছিল অমলের অস্তিত্ব।

মেয়েটি একটু পরেই অবলীলায় শুয়ে পড়েছিল অমলের বিছানায়। বিছানাটা সঙ্গে সঙ্গে নদীর ঢেউ হয়ে গেল। ঝড় নয়, মৃদু দুলুনি। ঘরের দেওয়াল হয়ে গেল গাছপালা।

সে অমলের একটি হাত ধরলেও অমল পাশ ফিরতে ভয় পেয়েছিল। ঠিক ভয় নয়, বিস্ময় ভাঙার দ্বিধা। অনেক দিনের একটা স্বপ্নকে মুঠোয় ধরার দুঃখ। না-পাওয়ার বিলাসিতাকে আঁকড়ে থাকার সাধ।

অমল জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কে?

মেয়েটি খুব চেনা ও ঘনিষ্ঠ হয়ে খিলখিল করে হেসে বলেছিল, তুমি আমার নাম জানো না?

মাঠটা এখন একেবারে জনশূন্য নয়। একপাল ছাগল নিয়ে যাচ্ছে একটা ঢ্যাঙা ছেলে, চারাপোনা ভর্তি মাটির হাঁড়ি মাথায় নিয়ে যাচ্ছে দুটি বালক, একটা গরুর পেছনে পেছনে এক গোবর কুড়ুনী, ছাতা মাথায় এক ব্যস্ত ব্যাপারী। কেউ কেউ অমলকে চেনে, কেউ চেনে না। অমল কারুর দিকে তাকাচ্ছে, কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। কথা বলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে অমল। কে যেন অমলকে ডাকছে।

আপাতত সেই ডাকের কোন ধ্বনি নেই।

একটা খেজুর গাছের ডগার কাছে পাক খাচ্ছে একটা চিল। তীক্ষ্ণ স্বরে সে যেন ভয় দেখাচ্ছে কিছুকে। খেজুর গাছের অন্দরে কাঠঠোকরা পাখি বাসা করে। ওরা চিলকে ভয় পায় না, তবে আর কী আছে ওখানে?

সরু থেকে ভগ্নাংশ হয়ে গেছে বৃষ্টি, এখন বৃষ্টির জন্য আকাশের মন নেই। পাতলা মেঘ, গর্জন করে নি একবারও। অমলের বাবা মাঝে মাঝে মেঘের ডাক নকল করেন। রান্না ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি ক্রুদ্ধ মহাদেবের মতন হাঁক পাড়েন, অমু! অমু!

রান্না ঘরের পাশেই একটা টালির চালের ঘর হেলে পড়ে আছে। খুঁটি ভাঙা এ ঘরটা আর মেরামত করা হয় না। ভেতরে বহু রহস্যময় ভাঙা চোরা জিনিস। একদিন একটা ওষুধ খাবার খল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, পিসি বলেছিলেন, স্তাখ তো ঐ আঁতুর ঘরটার মধ্যে আছে কি না। ঐ ভাঙা ঘরটার ডাক নাম আঁতুর ঘর। কোনো এক সময় সেই উদ্দেশ্যেই ছিল, অমল কখনো ব্যবহৃত হতে দেখেনি, সে দেখেছে, এ ঘরে থাকতেন ঠাকুমা। বাবা, জ্যাঠামশাই, পিসিমা সবাই এ ঘরে জন্মেছেন, শেষ বয়েসে থাকতেন একলা জন্মদাত্রী, তিনি তখন অন্ধ। অমল তার জ্ঞান হওয়া থেকেই ঠাকুমাকে অন্ধ দেখেছে, সাদা উলের মতন মাথার চুল, দাঁতহীন, নিঃশব্দ, সুন্দর হাসি।

বাবা যখনই ডাকতেন, অমু, অমু, তখনই আঁতুরঘর থেকে ঠাকুমা সাড়া দিতেন, যাই, যাই! এটা একটা হাসাহাসির ব্যাপার ছিল। অন্য কারুর নয়, শুধু বাবার গলায় অমু ডাক শুনলেই ঠাকুমা ভাবতেন তাঁকে ডাকা হচ্ছে। অন্ধকার ঘর থেকে রোদ্দুরের উঠোনে বেরিয়ে আসতেন অন্ধ বুড়ি। অমল তখন চালতা গাছের

আড়ালে লুকোতো।

মাকে সব চেয়ে সুন্দর দেখাতো, যখন মা সন্ধেবেলা তুলসীমঞ্চের সামনে হাঁটু গেড়ে বসতো, গলায় আঁচল জড়িয়ে। গলায় আঁচলটা জড়ালেই কেমন চেহারাটা বদলে যায়। কোথাও কোনো হাঁটু-গেড়ে-বসা নারীকে দেখলেই অমলের ইচ্ছে করে তার শাড়ির আঁচলটা গলায় জড়িয়ে দিতে। মায়ের আঁচলের প্রান্তে যে চাবির গোছাটা বাঁধা থাকতো, সেটা কবে যেন হারিয়ে গেল।

মাঠের মধ্যে পড়ে আছে একটা ভাঙা বাঁশী।

যারা ছাগল-গরু চড়ায়, তারা কেউ বাঁশী বাজায় না, তবে ওটা কার? রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, বাঁশীটা যেন অন্তর্জলীযাত্রায় রয়েছে।

বাতাসে শুধু শোনা যাচ্ছে অমলের নিঃশ্বাসের শব্দ। সে মোটেই হাঁপিয়ে পড়েনি। তার বালিশে মাথা-দেওয়া সেই মেয়েটি বলেছিল, তোমার কী সুন্দর স্বাস্থ্য, পেয়ারা গাছের ডালের মতন তোমার হাত···। অমল মেয়েটির রূপ নিয়ে কিছু বলেনি, বিস্ময়ে তার ঠোঁট আড়ষ্ট হয়ে ছিল। সে শুধু দেখছিল, নিষ্পলক চোখে।

দড়ি না আগুন? অমল জলে ডুববে না। আগুনে তার বড় ভয়। দড়িই ভালো। জীবনে সেই একবারই অমল ভেবেছিল, সে শেষ হয়ে যাবে, সে মিলিয়ে যাবে, ঠাকুমার মতন, মায়ের মতন, পিসিমা-বাবা-দিদিদের রেখে, সে আর অমল থাকবে না। চালতা গাছের আড়ালে আর তাকে লুকোতে হবে না।

আর কেউ বাড়িতে ছিল না সেই রাতে। অমলের বাড়ি পাহারা দেবার কথা। মানুষ আসলে সারা জীবন ধরে নিজেকে পাহারা দেয়, দিতে দিতে এক এক সময় ক্লান্তও হয়, মনে হয়, দিই, দিই না হাল ছেড়ে! ভেসে যায় অকূলে! কী ই বা আর হবে! বড় মোহময় সেই ইচ্ছে। অকূলের টান।

এক বালিশে মাথা রেখে মেয়েটি হাসি ছড়িয়ে দিয়েছিল

নিজের সারা শরীরে।

অমল জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কে ?

মেয়েটি বলেছিল, তুমি আমাকে চেনো না ?

অমল বলেছিল, না।

মেয়েটি তার পান খাওয়া ঠোঁটে ঢেউ খেলিয়ে বলেছিল, আমার নাম চাকরি।

মিথ্যে কথা বলেছিল মেয়েটি। চাকরির রূপ মোটেই ওরকম রমণীয় নয়। চাকরিতো পেয়েছিল অমল শেষ পর্যন্ত, অন্য একশো আটচল্লিশজন যুবককে ডিঙিয়ে। বাবার হাতে প্রথম মাসের টাকাগুলো তুলে দেবার সময় খড়মড় শব্দ হয়েছিল। একটা নোট মাটিতে পড়ে গেল। অমলের আগে বাবাই নিচু হয়ে তুললেন। অমলের সামনে বাবার সেই প্রথম নিচু হওয়া। কষ্ট হয়েছিল অমলের।

দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে দেখা যেত একশো উনপঞ্চাশজনই সমান। তবু অমল জয়ী হয়েছিল। এক মাস এগারোদিনের বেশি সে জয় রাখতে পারেনি। সব সময় অমলের পিঠ জ্বালা করতো। একশো আটচল্লিশ জোড়া চোখ যেন ক্রোধে, ঘৃণায় তাকে দগ্ধ করছে। ছটফট করতে করতে অমল সেই মেয়েটিকে খুঁজেছে। কিন্তু কোথায় সে!

মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে অমল। কে যেন অমলকে ডাকছে।

এবার একটু আধটু ঘাম জমেছে তার কপালে। নীল জামাটা পিঠের কাছে সামান্য ভিজে আরও গাঢ় হয়েছে। বৃষ্টি-বৃষ্টি মেঘ না থাকলে সূর্য এতক্ষণে অনেক কঠিন হতো। মাটিতে এখন ঘাস। দূরের গাছপালার সারি এখন আর তেমন দূর নয়। পেছনের দিগন্ত বরং অনেক সরে গেছে, যেখানে অমলের বাড়ি। তার ঘরের নিজস্ব বিছানা। সেই বিছানার এক বিন্দু তুলো অমলের বুকে। এবার

সেই ফুলোটাও ঝরে পড়লো।

মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে অমল। কে যেন অমলকে ডাকছে।

অমল দৌড়ে যাচ্ছে, না আসছে। এদিকেই আসছে। অনেক কাছে এসে পড়েছে। কে ডাকছে অমলকে?

না, সেই মেয়েটি নয়। আমি।

এসো অমল! এবার কাহিনীতে প্রবেশ করো। তোমাকে নিয়ে গল্প লেখা হবে।

একটা সরু গলির শেষ প্রান্তে সেই বাড়িটি। ট্যাক্সিওয়ালা বড় রাস্তায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। এ দেশের ট্যাক্সিওয়ালারা একেবারে ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ির দোর গোড়ায় নামিয়ে দেয়, কিন্তু এই সরু গলিতে গাড়ি ঢুকবে না, ভারি সুটকেসটা আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

দুপুরবেলা, কোনো জন-মনুষ্য নেই, থাকার কথাও নয়। গলিটার দু' পাশে উঁচু দেয়াল, একেবারে নিরেট, মনে হয় কোনো কল-কারখানা আছে দু' ধারে। বাড়িটার দরজার সামনে এসে ঠিকানাটা ভালো করে দেখে নিয়ে আমি বেলের বোতামে হাত দিলাম।

একটু পরে দরজা খুললো একজন লোক, বয়েস হবে চল্লিশের কাছাকাছি, মুখে না-কামানো দাড়ি, ময়লা জিনসের প্যান্ট আর একটা গেঞ্জি পরা, হাতে একটা হাতুড়ি। কিচ্ছু না বলে সে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

সুটকেসটা নামিয়ে রেখে বললাম, আমি ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি, এটা নিশ্চয়ই একটা গেস্ট হাউস? এখানে আমার একটা ঘর বুক করা আছে আজ থেকে।

লোকটি তবু নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো বলে আমি পকেট থেকে চিঠিটা বার করে দেখালাম।

সে চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। দরজা খোলা রেখে। দুমদাম করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পায়ের শব্দ পেলাম।

এক মিনিট বাদেই সে ফিরে এলো হাসি মুখে। হাতুড়িটা রেখে এসেছে, প্যাণ্টে হাত মুছে সে তুলে নিল আমার সুটকেসটা। মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো ভেতরে আসবার জন্য।

এসব দেশে নিজের মালপত্র নিজেকেই বইতে হয়। আর এটা

তো হোটেল নয় যে কোনো বেল বয় থাকবে। আমি লোকটিকে বললাম, না, না, সুটকেসটা আমিই নিচ্ছি। লোকটি সে কথা শুনলো না. দ্রুত এগিয়ে গেল।

এ পর্যন্ত লোকটি একটিও শব্দ উচ্চারণ করেনি। বোবা? সাহেব-বোবা আমি কখনো দেখিনি আগে।

সরু কাঠের সিঁড়ি, কার্পেট নেই, বেশ খানিকটা দৈন্য দশা বলেই আমি মনে হয়। আমি অসন্তুষ্ট হলাম। যে-সব বাড়ির দু'-একটা ঘর বাইরের লোকদের ভাড়া দেওয়া হয়, তার একটা নির্দিষ্ট মান থাকার কথা। এরকম ভাঙাচোরা সিঁড়ি কেন?

উঠতে হলো তিনতলায়। এখানটা অবশ্য বেশ ঝকঝকে তকতকে। সদ্য রং করা ও ওয়াল পেপার বদলানো হয়েছে বোঝা যায়। ঘরে সুন্দর বিছানা পাতা। বাথরুমটি পরিচ্ছন্ন। অভিযোগ করার কিছু নেই।

সেই লোকটি বাথরুমের কল খুলে গরম জল, ঠাণ্ডা জল দেখিয়ে দিল, একবার ফ্লাস টানলো, আলোর সুইচ জ্বালালো-নেভালো, সবই নিঃশব্দে।

সামনা সামনি দুটো ঘর, মাঝখানে বসবার জায়গা। একটা শ্বেত পাথরের টেবিল। তার ওপর একটি চিঠি চাপা দেওয়া। লোকটি সেই চিঠিটা দিল আমাকে।

তাতে ইংরেজিতে আমার উদ্দেশ্যেই লেখা আছে যে, তোমার ঘর প্রস্তুত। তোমার বিছানায় পাশের টেবিলের ড্রয়ারে একটি চাবি আছে। তুমি যখন খুশি যাওয়া আসা করতে পারো, ওই চাবিতে সদর দরজা খোলা যাবে। তোমার আর কিছুর প্রয়োজন থাকলে সন্ধেবেলা আমাকে জানিও।

তলায় একজন মহিলার সই।

আমি বললাম, থ্যাংক ইউ। আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

লোকটি হাসি মুখে আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে চলে গেল।

আমি সুটকেস খুলে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। এখন থেকে সাতদিন এই ঘরের মধ্যে আমার সংসার। হোটেলের চেয়েও এই ধরনের গেস্ট হাউস আমার বেশি পছন্দ। খরচ একটু কম পড়ে তো বটেই, তা ছাড়াও একটা বাড়ি-বাড়ি বোধ থাকে। হোটেলগুলো সব দেশেই প্রায় একই রকম আর একঘেয়ে।

ভালো করে স্নান সেরে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

খিদে নেই, শরীর এখন ঘুম চাইছে। বহুক্ষণ প্লেন জার্নি করে এলে মাথাটা কেমন অবশ হয়ে যায়।

বিছানাটা বেশ নরম। জানলাগুলোতে সাদা সিল্কের পর্দা। ভেবেছিলাম শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়বো, কিন্তু তা হলো না। ঘুমের প্রয়োজন হলেই যে ঘুম আসবে তার তো কোনো মানে নেই। এক একসময়ে ঘুমের পায়ে ধরে সাধাসাধি করলেও ঘুম আসে না।

খানিকক্ষণ ছটফট করার পর হঠাৎ মনে পড়লো, দুটো টেলিফোন করা খুব দরকার। এ ঘরে টেলিফোন নেই। হোটেলের তুলনায় এই একটা অসুবিধে। অধিকাংশ গেস্ট হাউসেই টেলিফোন ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকে না।

বোবা লোকটি ছাড়া এ বাড়িতে আর কোনো লোক আছে বলে মনে হলো না। ওর কাছ থেকে কিছু জানারও উপায় নেই। রাস্তায় বেরুলেই অবশ্য টেলিফোন বুথ পাওয়া যাবে। ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটি আমার একেবারে অচেনা নয়, আগে এসেছি।

জামা-প্যান্ট-জুতো পরে আবার তৈরি হয়ে নিতে হলো। চাবিটা নিয়ে নামবার সময় দেখলাম, সেই লোকটি হাতুড়ি-করাত নিয়ে সিঁড়ি সারাচ্ছে। এক জায়গায় কাঠ-কাঠ সব খুলে ফেলেছে, আমাকে ডিঙিয়ে যেতে হলো, লোকটির সঙ্গে হাসি বিনিময় করলাম।

ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে দেখি, তখনও সে একমনে কাজ করে যাচ্ছে। সিঁড়ির অনেকটা অংশ সে নতুন করে ফেলেছে।

তাঁর গেঞ্জিটা ভিজে গেছে ঘামে।

সন্ধের সময় গৃহকর্ত্রী আমার খবর নিতে এলো। বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারার জার্মান মহিলা, মুখের ভঙ্গি প্রাশিয়ানদের মতন। মোটামুটি কাজ-চালানো ইংরিজি জানে। কাছাকাছি ট্রাম-স্টপ, বাস-স্টপ ও হোটেল রেস্তোর্ঁার কথা জানিয়ে দিল আমাকে। আমি ভাড়ার টাকা দিয়ে দিলাম অগ্রিম।

সেই বোবা লোকটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণত বোবারা কালাও হয়। কিন্তু এই লোকটি যেন সব কথা শুনছে মন দিয়ে। ওর গলায় বেশ বড় একটা লকেট, তাতে কার যেন একটা ছবি। আমাদের দেশে যেমন সাঁইবাবা কিংবা অন্য কোনো গুরুর ছবি অনেকে গলায় ঝোলায়. সেই রকমই কোনো ব্যাপার মনে হলো। লোকটি আপন মনে লকেটটি নাড়াচাড়া করছে এক হাতে।

মহিলাটি বললো, আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার তো আগেই আলাপ হয়েছে? আমি সারাদিন বাড়ি থাকি না। কিন্তু ফিলিপ থাকবে। তোমার যখন যা প্রয়োজন হয়, এর কাছে চাইবে।

এই বোবা লোকটি এই মহিলার স্বামী? আমি ওকে ছুতোর মিস্তিরি ভেবেছিলাম। তাড়াতাড়ি ডান হাত বাড়িয়ে ওর সঙ্গে করমর্দন করলাম। ওর হাসিটি বেশ সারল্য মাখা।

গৃহস্বামিনী তার নিজের খুব একটা শক্ত নাম বলে বললেন, আমাকে অবশ্য এ নামে কেউ ডাকে না, আমাকে সবাই নোরা বলে। এবং আগেও আমাদের এখানে দু' একজন ভারতীয় অতিথি থেকে গেছে। তাদের কোনো অসুবিধে হয়নি। আশা করি, তোমারও···

আমি বললাম, না, না, চমৎকার জায়গা। রেল স্টেশনেরও খুব কাছে। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এখান থেকে বুক ফেয়ার যাওয়া-আসারও সুবিধে হবে।

নোরা বললো, আমরাও একদিন বুক মেসে দেখতে যাবো।

তুমি কি আমাদের জন্য টিকিট এনে দিতে পারবে? আমার স্বামী খুব বই ভালোবাসে, ও নিজেও একজন কবি।

আমি আবার চমকে উঠলাম। সঙ্গীত স্রষ্টা বিথোফেন একসময় কালা হয়ে গিয়েছিলেন, হোমার-মিল্টন হয়েছিলেন অন্ধ, কিন্তু মূক ব্যক্তি কখনো কবিতা রচনা করেছে, এমন শুনিনি।

নোরা বললো, ও অবশ্য জার্মান ভাষায় লেখে না। লেখে ম্যাসিডোনিয়ান ভাষায়।

আমি বললাম, মাকেদোনিয়ান?

এবার নোরা একটু চমকে উঠলো। কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে বললো, তুমি ওই ভাষার কথা জানো? আমরা জার্মান নই, মাকেদোনিয়ান।

আমি আরও একটু জ্ঞান ফলাবার জন্য বললাম, তার মানে তোমরা ঠিক কোথাকার? মকেদোনিয়া নামে তো কোনো দেশ নেই। সে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে খানিকটা বুলগেরিয়া, খানিকটা যুগোশ্লাভিয়া আর খানিকটা গ্রীসের মধ্যে ঢুকে গেছে। বোধহয় আলবেনিয়ার মধ্যেও কিছুটা গেছে, তাই না? তোমরা কি যুগোশ্লাভিয়া থেকে এসেছো? আমি একবার···

আমার কথা শেষ হবার আগেই একটি কাণ্ড ঘটলো।

এতক্ষণ যাকে বোবা ভেবেছিলাম, এবার সে কথা বলে উঠলো। বেশ রাগত স্বরে সে কী যেন জিজ্ঞেস করলো নোরাকে। সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ভাষা।

তারপর নোরা আর ফিলিপ নিজেদের মধ্যে কথা বলে যেতে লাগলো ওই ভাষায়। যেন ঝগড়া করছে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বোকার মতন।

একটু বাদে নোরা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমার স্বামী তোমাকে ভেবেছে স্পাই! আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছি যে তুমি ইণ্ডিয়ান, তোমার এ ব্যাপারে কোনো স্বার্থ নেই, ইণ্ডিয়ানরা

এসব সাতে-পাঁচে থাকে না…

বাঃ বাবা আমাকে স্পাই ভেবেছে? তার মানে এখানে কি কোনো গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপার চলছে? বোমা-বন্দুক বানায়? এ কোথায় এলাম?

নোরা আমাকে গুটেন নাখট জানিয়ে স্বামীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। দু' জনে তখনো তর্কাতর্কি করছে।

খুব একটা ভয় না পেলেও আমার খানিকটা দুশ্চিন্তা হলো ঠিকই। হঠাৎ স্পাই-এর কথা উঠলো কেন? বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে কোনো গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়বো না তো? একজন লোক কথা বলতে পারে, তবু বোবা সেজে থাকে, এটাও বেশ সন্দেহজনক!

ফিলিপের মুখখানা দেখলে তাকে সরল, ভালোমানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু হঠাৎ সে রেগে উঠলো কেন? আমি এমন কী বলেছি?

কয়েক বছর আগে আমি যুগোশ্লাভিয়াতে ওখরিদ নামে একটা হ্রদের পারের ছোট্ট শহরে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলন হয়। সেখানে গিয়েই আমি শুনেছিলাম যে সে অঞ্চলের ভাষা হচ্ছে ম্যাসিডোনিয়ান এবং সেই ভাষার দাবি-প্রতিষ্ঠার জন্য একটা আন্দোলন চলছে। আমি যে বাংলা কবিতাটি পাঠ করেছিলাম, তার অনুবাদ শোনানো হয়েছিল ম্যাসিডোনিয়ার ভাষায়!

ম্যাসিডোনিয়া! নামটা শুনলেই রোমাঞ্চ হয়।

যীশুর জন্মেরও প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে ওই ছোট্ট একটা দেশের রাজা ফিলিপের ছেলে আলেকজাণ্ডার দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আমাদের দেশের গল্পে-ইতিহাসে আলেকজাণ্ডারের একটা বিশেষ স্থান আছে, তার কারণ, পারস্য, মিশর, ব্যাবিলন পায়ের তলায় মাড়িয়ে এলেও দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ভারত জয় করতে পারেননি। তক্ষশিলার বিশ্বাসঘাতক রাজার সাহায্য নিয়ে তিনি ঝিলাম নদীর পারে। মহারাজ পুরুকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন

বটে, কিন্তু পুরুর পরাক্রম দেখে তিনি তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বও করেছিলেন। ভারতীয় সৈন্যদের শৌর্য দেখে আলেকজাণ্ডারের বাহিনীও আর এগোতে চায়নি, গঙ্গা পার হননি আলেকজাণ্ডার।

আমার ধারণা ছিল, এত হাজার বছরের ইতিহাস-ভূগোলের নানান ওলোট-পালোটে ম্যাসিডোনিয়া নামটা মুছে গেছে মানচিত্র থেকে। আলেকজাণ্ডারের অকাল মৃত্যুর পরই তাঁর সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ম্যাসিডোনিয়া নামটা তো আর কোথাও পাইনি।

কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া গিয়েই জানতে পারলাম, ম্যাসিডোনিয়া নামে দেশটা হারিয়ে গেলেও সে নামটা এখনো লুপ্ত হয়নি। তিন-চারটি দেশে ছড়িয়ে আছে ম্যাসিডোনিয়া, সেই প্রাচীন ভাষা এখনো গ্রীক কিংবা সার্বো-ক্রোয়াশিয়ানের সঙ্গে টক্কর দেয়। ম্যাসিডোনিয়া নামটারও আসল উচ্চারণ মাকেদোনিয়া।

জার্মানিতে বহু জাতের মানুষ থাকে। আমি এসে পড়েছি এক ম্যাসিডোনিয়ান পরিবারে। কিন্তু এরা স্পাই-এর ভয় পায় কেন? এরা এখানে অবৈধভাবে আছে? কিন্তু আমিও তো আন্দাজে এখানে আসিনি। বইমেলা কর্তৃপক্ষের কাছে হোটেল ও গেস্ট হাউসের একটা তালিকা থাকে, সেখান থেকে ঠিকানা দেখে আমি আগে যোগাযোগ করেছি। বইমেলা কর্তৃপক্ষ তো ভালো করে খোঁজ খবর না নিয়ে কারুর নাম সুপারিশ করবে না। তারা গেস্ট হাউসগুলোও পরিদর্শন করে যায়। সুতরাং এদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনো গণ্ডগোল থাকলে ধরা পড়ে যেত।

এরা যদি বোমা-বন্দুকের কারবারি হয়, তা হলে সামান্য কিছু টাকার জন্য বাইরের অতিথি রাখবেই বা কেন?

সকালবেলা ঘুম ভাঙার পরেই মনে পড়লো চায়ের কথা।

গেস্ট হাউসে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে না, বাইরেই খেতে হয়, কিন্তু সাধারণত ব্রেক ফাস্ট দেয়। কিন্তু হোটেলের মতন ঘরে চা দিয়ে যাবে না নিশ্চয়ই। ঘুম ভাঙার পর চায়ে চুমুক না দিলে

আমরা দিনটাই শুরু করতে পারি না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মনে হলো, লজ্জা করে লাভ নেই, নিচে গিয়ে চাইতে হবে।

তিনতলার অন্য ঘরটিতে কেউ আসেনি। দোতলা-একতলায় ওরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কারুর অস্তিত্ব টের পাইনি।

সিঁড়ির মুখটায় দাঁড়াতেই দেখলাম, একতলার একটি ঘর থেকে ঘুমচোখে বেরিয়ে এলো স্বামীটি। একটা হাফ-প্যান্ট পরা, খালি গা। মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়েই সে পেছন ফিরে এক দৌড় মারলো। ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

এই রে, লোকটা বোধহয় আমার ওপর এখনো রেগে আছে।

কিন্তু রাগ করুক আর নাই করুক, আমার তো চা না হলে চলবে না। মহিলাটিকে ডাকি কী করে? নেমে এলাম নীচে।

ফিলিপ আবার বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। এখন প্যান্ট-শার্ট পরা, খুব তাড়াতাড়ি ভদ্রস্থ হয়ে এসেছে। খালি-গায়ে ছিল বলে আমাকে দেখে লজ্জা পেয়েছিল।

মাথা নেড়ে বললো, 'মর্নিং!' মর্নিং!

ফিলিপ তা হলে ইংরিজিও জানে? কাল আমার সামনে একটি অক্ষরও উচ্চারণ করেনি। এটাই বা কী রহস্য?

ড্রেসিং গাউন পরে এবার বেরিয়ে এলো নোরা। সুপ্রভাত বিনিময় করার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, দয়া করে আগে এক কাপ চা দিতে পারবে কী? ব্রেক ফাস্ট পরে খাবো। আগে একটু চা চাই।

মহিলাটি খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে বললো, ব্রেক ফাস্ট? তোমার সঙ্গে যে রেট ঠিক হয়েছে, তার মধ্যে তো ব্রেক ফাস্ট নেই। ব্রেক ফাস্টের জন্য ডেলি আরও পঁচিশ মার্ক বেশি লাগে। তুমি সে কথা কিন্তু চিঠিতে জানাওনি।

আমি বললাম, ও! দুঃখিত! দুঃখিত! ঠিক আছে, আমি

ব্রেক ফাস্ট বাইরে খেয়ে নেবো!

ওপরে উঠতে উঠতে হিসেব কষলুম। পঁচিশ মার্ক? ওতে আমার লানচ হয়ে যাবে। জ্যাম-জেলি-বিস্কিট কিনে ঘরে বসে খেলে সস্তা পড়বে অনেক। দরকার নেই আমার ব্রেক ফাস্ট।

মুশকিল হচ্ছে এই যে চা খেতে হলেও এখন জুতো-মোজা পরে বেরুতে হবে বাইরে। বাসি মুখে চা খাওয়া আমার অভ্যেস। বাথরুম-টাথরুম কিছুই সারা যাবে না। সকালবেলা উঠেই টাকা-পয়সার কথা শুনে মেজাজ বিগড়ে গেল।

কোনো রকমে মুখ চোখ ধুয়ে এসে মোজাটা সবে পায়ে গলিয়েছি, সেই সময় নোরা এসে দাঁড়ালো খোলা দরজার কাছে। হাতে একটা ট্রেতে চায়ের পট, আর একটা ক্রোয়াশ°।

আমি একটু বিরক্ত ভাবে বললাম, আমি তো চাইনি। বাইরে খেয়ে নেবো।

নোরা বললো, এটা ফ্রি! এটা ফ্রি!

শুনে আমার আরও খারাপ লাগলো। কেন আমি ওর দয়ার দাক্ষিণ্য নিতে যাবো? এরা যদি এক কাপ চায়ের দাম নিয়েও, হিসেব কষে, তা হলে আমিই বা বিনা পয়সায় নেবো কেন?

চা তৈরি করে এনেছে, ফেরানো যায় না। বললাম, না, না, তুমি কেন ফ্রি দেবে? ঠিক আছে, আজকের পঁচিশ মার্ক দিয়ে দিচ্ছি কাল থেকে তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

নোরা আবার বললো, তোমার পয়সা দিতে হবে না। আমার স্বামী তোমার জন্য এটা বানিয়ে দিয়েছে।

নোরার ইংরেজি ভাঙা ভাঙা। সব কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। ভাষাজ্ঞানের অভাবেই ওর মুখে পয়সার কথাটা অমন রূঢ় শুনিয়েছে। না হলে, এককাপ চা চাইলে এদেশে কেউ দাম চায় না। ও বোধহয় ভেবেছিল, শুধু ঘর-ভাড়ার রেট দিয়ে আমি ওর কাছে ব্রেক ফাস্ট দাবি করছি।

ট্রে-টা নামিয়ে রেখে নোরা বললো, আমাকে খুব তাড়াতাড়ি অফিস যেতে হয়, ব্রেক ফাস্ট বানাবার সময় পাই না। তবে, তুমি যদি চাও, তা হলে আমার স্বামী তোমাকে বানিয়ে দিতে পারে। কাল তুমি ফিলিপের কথা শুনে রাগ করোনি তো?

আমি বললাম, আমি তো ওর ভাষা বুঝতে পারিনি। রাগ করবো কী করে? তোমার স্বামী কি আমার কোনো কথা শুনে রাগ করেছে?

নোরা বললো, না, রাগ করেনি। একটু দুঃখ পেয়েছে। তুমি যে বললে, মাকেদোনিয়া নামে কোনো দেশ নেই! সেই কথা শুনে।

একটু হেসে নোরা নিজের বুকের মাঝখানে একটা হাত রেখে বললো, আসলে ওই দেশটা এখনো আছে। এখানে।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তাতো বটেই। আচ্ছা, তোমার স্বামী ইংরিজি জানে, কিন্তু অন্য লোকদের সামনে বলে না কেন?

নোরা বললো, ও খুব কমই ইংরিজি জানে। আমার চেয়েও কম। কিন্তু ও ইংরিজি বা জার্মান কিছুই বলতে চায় না। মাকে-দোনিয়ান ভাষায় তো ফিলিপ কবিতা লেখে, বিদেশে থাকতে থাকতে সেই ভাষা যাতে ও না একটুও ভুলে যায়, তাই সব সময় সেই ভাষাই বলে। সে ভাষাতেই চিন্তা করে।

কিন্তু তোমার স্বামী যখন বাইরে যায়, কিংবা চাকরি বাকরি করতে গেলে তো মাকেদোনিয়ান ভাষা চলবে না।

ও বিশেষ বাইরে যায় না। ও একজন কবি, চাকরি করবে কেন? এ বাড়িতেই ওর অনেক কাজ। আমি চাকরি করি, সেটাই যথেষ্ট।

তোমার স্বামীর কবিতার অনুবাদ হয়নি?

নাঃ! কে করবে?

নোরা চলে যাবার পর মনে পড়লো, আমাকে কেন ফিলিপ স্পাই ভেবেছিল, সেটা তো জিজ্ঞেস করা হলো না। স্বামী কবিতা লেখে বলে বউ তাকে চাকরি করতে দেয় না, এ যে দারুণ ব্যাপার! আগে কখনো শুনিনি।

এরপর দু' তিনদিন আমি ব্যস্ত রইলাম, ওদের সঙ্গে দেখাই হলো না ভালো করে। যাওয়া-আসার পথে দেখেছি, বিকেলের দিকে এ বাড়িতে আরও কিছু লোক আসে, প্রায় সবাইই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, দোতলার একটা ঘরে ঢুকে যায়। তাদের অতি নিরীহ চেহারা। ফিলিপ সিঁড়ি সারায়, ইলেকট্রিকের লাইন ঠিক করে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলে একটু হাসে।

আমি ঘরেই চায়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছি। ব্রেক ফাস্ট, লাঞ্চ বাইরে খাই, রাত্তিরে প্রায়ই নেমন্তন্ন থাকে। কোনো অসুবিধে নেই।

দিন চারেক পরে এক সকালবেলা নোরা এসে বললো, আজ তুমি আমাদের সঙ্গে ব্রেক ফাস্ট খাও।

আমি বললাম, কেন? আমার ঘরেই অনেক খাবার রয়েছে, আজ আর অন্য কিছু খাবারের দরকার নেই।

নোরা বললো, আজ আমার ছুটি। ফিলিপ প্যান কেক বানাচ্ছে। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে খেতে আসো, আমরা খুশি হবো।

এরপর আপত্তি করা যায় না। আমি এক প্যাকেট বেকন-বিস্কিট কিনে রেখেছিলাম, সেটা নিয়ে নেমে গেলাম নীচে। রান্না-ঘরটি ছোট, তার মধ্যেই ডাইনিং টেবল। এদেশের রীতি অনুযায়ী কারুকে রান্না ঘরে আড্ডা দিতে ডাকা মানে ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত।

ফিলিপ গায়ে একটা অ্যাপ্রন বেঁধে প্যানে কী যেন ভাজছে। আমার দিকে তাকিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গি করে বললো, 'মর্নিং! মীট! এগ?'

শুধু কয়েকটা ইংরিজি শব্দ, কোনো ক্রিয়াপদ নেই! নোরা বলেছিল, ওর স্বামী মাকেদোনিয়ান ভাষায় লেখে বলে, অন্য কোনো ভাষা বলে না। ওই ভাষাতে চিন্তা করে সব সময়। আমাকে দেখে আজ যে দয়া করে দু' চারটি ইংরিজি শব্দ বলছে, তাই-ই যথেষ্ট।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে টুকিটাকি প্রশ্ন করতে লাগলো নোরা। সাধারণ কৌতূহল। ফিলিপ কোনো প্রশ্ন করছে না, মন দিয়ে শুনছে। আমরা নানা রকম খাবারের সঙ্গে কাপের পর কাপ কফি খেয়ে যাচ্ছি।

একটু পরে একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে ওপরের কাবার্ড থেকে একটা বোতল নামালো ফিলিপ। সেটা আমার সামনে ধরে বললো, উজো! লাইফ।

নোরা বললো, এটা উজো। খাঁটি মাকেদোনিয়ান। খেয়ে দেখবে?

উজো আমি চিনি। এক রকমের গ্রীক মদ। অনেকটা আমাদের দিশি মদের মতন। সকালবেলা ও জিনিস পান করার কোনো ইচ্ছে নেই আমার।

আমি বললাম, না, এখন থাক। ফিলিপ বরং দু' একটা তার নিজের কবিতা পড়ে শোনাক না!

নোরা বললো, তুমি কি তা বুঝতে পারবে? তুমি আমাদের ভাষা জানো?

আমি বললাম, তা জানি না। বুঝবো না, ধ্বনিটা শুনবো। যুগোশ্লাভিয়ায় গিয়ে আমি তিন-চারদিন ধরে অনেকের মুখে মাকে-দোনিয়ান ভাষা শুনেছি, বেশ মিষ্টি ভাষা মনে হয়।

এটা আমি ওদের খুশি করার জন্যই বললাম। ওরাও শিশুর মতন খুশি হয়ে উঠলো। নোরা দৌড়ে গিয়ে কয়েকটা বই, পত্র-পত্রিকা ও বড় বড় রোল করা পোস্টার নিয়ে এলো।

ফিলিপ নোরাকে কী যেন বললো, নোরা আমাকে বুঝিয়ে দিল যে ফিলিপ নিজের কবিতা পড়বে না। লজ্জা লজ্জা পাচ্ছে। ও আমাদের ভাষায় অন্য কয়েকজন বড় বড় কবির লেখা শোনাচ্ছে।

শুনতে শুনতে আমি মাথা দোলাতে লাগলাম। খারাপ লাগছে না। পড়ার ভঙ্গি আর শব্দগুলির সমন্বয়ে কবিতার মর্ম খানিকটা ধরা যায়।

পড়তে পড়তে ফিলিপের গলা আবেগে কাঁপতে লাগলো এক সময়। বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। নোরা তাকে থামিয়ে দিয়ে কফি খেতে বললো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাকেদোনিয়ান ভাষা কত লোক পড়ে? কবিতার বই বিক্রি হয়?

নোরা মাথা নেড়ে বললো, তেমন কিছু হয় না। আজকাল মাকেদোনিয়ানরা অনেক দেশে ছড়িয়ে গেছে। নিজেদের ভাষার আর চর্চা করে না। সেইজন্যই আমরা আন্দোলন করছি।

ফিলিপ কাগজের রোলগুলো খুলে ফেললো। তাতে বেশ সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা, আর দু' এক লাইন কবিতা। চমৎকার সব পোস্টার।

ফিলিপ নিজের ভাষায় কী যেন বললো খানিকটা, নোরা বুঝিয়ে দিল, এইসব পোস্টার করে আমরা পার্টি ফাণ্ডে টাকা তুলি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কী পার্টি?

নোরা বললো, মাকেদোনিয়ান পার্টি। আমার স্বামী ফিলিপ তার লিডার।

ফিলিপ বাধা দিয়ে বললো, নো। মাদার! মাদার লিডার।

নোরা বললো, হ্যাঁ। ফিলিপ এখানকার লিডার। আর আমাদের সকলের লিডার হলো মা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কার মা? তোমার, না ফিলিপের?

ওরা দু'জন পরস্পরের দিকে তাকালো। তারপর কী ভাবে

উত্তর দেবে তার ভাষা খুঁজে না পেয়ে ভাঙা ভাঙা ভাবে বললো, মা, সকলের মা, আমাদের প্রেরণাদাত্রী। তিনি আমাদের শিক্ষা দেন, তাই তিনি মা। সকলের মা।

ব্যাপারটা ঠিক ধরা গেল না। আমি জানতে চাইলাম, তোমাদের পার্টি কী নিয়ে আন্দোলন করছে?

এর উত্তরে ওরা যা জানালো তা শুনে আমি প্রায় স্তম্ভিত।

ফিলিপ আর নোরা দু'জনেই জার্মানিতে এসেছে প্রায় তিরিশ বছর আগে, বাবা-মায়ের সঙ্গে। এখন ওরা জার্মান নাগরিক। কিন্তু এখানে বসে স্বাধীন মাকেদোনিয়ার আন্দোলন চালাচ্ছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকা ম্যাসিডোনিয়াকে এরা আবার সংযুক্ত করবে এবং সেটা হবে একটা স্বাধীন আলাদা দেশ। এই বাড়িটা সেই আন্দোলনের কেন্দ্র। যে-সব ম্যাসিডোনিয়ান জীবিকার সন্ধানে জার্মানিতে বসতি নিয়েছে, তাদের একত্র করার কাজ চলছে। এ বাড়ির ওপরের দুটি ঘর অতিথিদের ভাড়া দেওয়া হয় এই আন্দোলনেরই টাকা তোলার জন্য। নোরা এবং আরও কয়েকজন চাকরি করে যে টাকা পায়, সবই এই কাজে ঢেলে দেয়। ফিলিপ এখানকার চব্বিশ ঘণ্টার কর্মী।

ফিলিপের গলায় যে লকেটটা ঝুলছে, তার ভেতরের ছবিটা আমি এবার চিনতে পারলাম। কোঁকড়া, কোঁকড়া চুলওয়ালা আলেকজাণ্ডারের প্রোফাইল।

একমাত্র আলেকজাণ্ডারের জন্য ম্যাসিডোনিয়ার নাম সারা পৃথিবী জেনেছিল। তারপর আর কোনো দুর্ধর্ষ বীর সেখানে আসেনি। ইওরোপ-আফ্রিকা-মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল ভূভাগেই ওই ছোট্ট দেশটির আধিপত্য শেষ হয়ে যায় কিছু কাজের মধ্যেই। গ্রীকদের পর জেগে ওঠে রোমানরা। রোমান সাম্রাজ্য বিস্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাসিডোনিয়ার দর্প চূর্ণ হয়ে যায় চিরতরে। রোমানদের পরে এসেছিল বাইজানটাইন ও অটোমান শাসকরা।

অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্র থেকে মর্মর সাগর পর্যন্ত একটা রাস্তা ছিল প্রাচীন ম্যাসিডোনিয়ায়, সেই রাস্তাটা দখল করার লোভে বিদেশী শক্তি বারবার এখানে হানা দিয়েছে।

বহুকাল ধরে যে-দেশ সামরিক শক্তিহীন ও খণ্ড-বিখণ্ড, সেই দেশকে আবার সম্পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখছে কয়েকজন মানুষ জার্মানিতে বসে।

নোরা জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমাদের মন্দির দেখবে?

আমি আবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মন্দির? কোথায়?

নোরা বললো, এই বাড়িতেই। এসো!

আমি একটা সিগারেট ধরিয়েছিলাম, সেটা দেখিয়ে বললাম, এটা নিয়ে কি যাওয়া যাবে?

ফিলিপ আমাকে ইঙ্গিতে বোঝালো সিগারেটটা শেষ করে নিতে।

দোতলার একটি দরজা খুলে দেখা গেল প্রথমে একটা ছোট্ট ঘর। সেখানে সবাই জুতো খোলে। দেয়ালে কয়েকটি ছবি।

একটি ছবির দিকে আঙুল তুলে নোরা জিজ্ঞেস করলো, এটা কার ছবি জানো?

আমি চিনতে পারলাম না। নোরা খানিকটা গর্বের সঙ্গে বললো, অ্যারিস্টটল!

আমি কোনো ভক্তি না দেখিয়ে শুকনো গলায় বললাম, ও!

গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে সক্রেটিস আমার নমস্য, কিন্তু অ্যারিস্টটল আমার প্রিয় নন মোটেই। তিনি বলেছিলেন, যারা গ্রীক নয়, তাদের সকলকেই ক্রীতদাসের মতন গণ্য করা উচিত।

এর পর একটি বিরাট বড় হলঘর।

ঘরটিকে একটা মিউজিয়ামের মতন মনে হয়। সব দেয়াল জুড়ে অনেক ছবি, এদিকে ওদিকে বহু মূর্তি, পুরনো আমলের বাসন-কোসন, একদিকে সাজানো রয়েছে কিছু অদ্ভুত ধরনের পোশাক।

কয়েকজন নারী-পুরুষ এক কোণে বসে কিছু জামা-কাপড় সেলাই করছে, একজন মেঝেতে কাগজ ছড়িয়ে পোস্টার আঁকছে।

দেয়ালের ছবিগুলোর মধ্যে আলেকজাণ্ডারেরই তিন চারখানা। ইনিও আমার প্রিয় নন। ইতিহাসের এই সব দিগ্বিজয়ীদের নিয়ে অনেক রোমান্টিক কাহিনী তৈরি হয় বটে, কিন্তু আসলে তো এরা রক্তপিপাসু, নির্দয়, খুনী। ধ্বংসের সওদাগর। কুড়ি বছর বয়সে রাজা হয়ে আলেকজাণ্ডার এক দুর্ধর্ষ বাহিনী গড়ে তুলে ছিলেন দুঃসাহসী ও অকুতোভয় এই ছোকরাটির পরাক্রমের তুলনা ছিল না ঠিকই, আরও কয়েকটি গুণও ছিল, যা না থাকলে নেতৃত্বই দেওয়া যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বদরাগী, প্রচণ্ড মাতাল ও নিষ্ঠুর। মদের ঝোঁকে তিনি পার্সিপোলিস নগর পুড়িয়ে দেননি? নেশাগ্রস্ত অবস্থায় খুন করেননি অতি ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে?

রাজা হবার পরই আলেকজাণ্ডার গিয়েছিলেন ডেলফির মন্দিরে দৈববাণী শুনতে। সেখানে এক পিথিয়ান সন্ন্যাসিনী তাকে বলেছিলেন, বৎস, তুমি অজেয় হবে। তারপর বহু রাজ্য জয় করতে করতে আলেকজাণ্ডারের ধারণা হয়ে গিয়েছিল, তিনি সত্যিই অজেয়, সমস্ত বিশ্ব তাঁর পদানত হবে। ক্ষমতার মদ গিলতে গিলতে এক সময় সেই যুবকটির বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে তিনি সাধারণ মানুষ নন, তিনি দেবতা, তিনি জিউসের সন্তান। তেত্রিশ বছর বয়েসে তিনি এক উন্মাদ। তিনি চেয়েছিলেন, জীবন্ত দেবতা হিসেবে সবাই তাঁকে মান্য করুক। স্পার্টানরা চাপা ঠাট্টার সুরে বলেছিল, আলেকজাণ্ডারের যখন এতই দেবতা হবার ইচ্ছে, তা হলে হোন তিনি এক দেবতা!

অতি অল্প বয়েসে সেই দেবতাটির মৃত্যু হয়েছিল অতিরিক্ত মাতলামিতে।

নোরা আর ফিলিপ আমাকে দেওয়ালের অন্য ছবিগুলো বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। সেগুলো ম্যাসিডোনিয়ার অন্যান্য বীর পুরুষ,

কবি ও নাট্যকারদের। কস্মিনকালেও ওঁদের কারুর নাম শুনিনি।

আমার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন খচখচ করছিল। যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীসের মধ্যে ছড়িয়ে আছে টুকরো টুকরো ম্যাসিডোনিয়া, সেগুলোকে ওরা এক করবে কোন পন্থায়? ওই সব দেশ ছাড়বে কেন? এরা কি যুদ্ধ কিংবা সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে ম্যাসিডোনিয়াকে স্বাধীন করতে চায়?

কিন্তু এ প্রশ্ন করা বোধহয় আমার পক্ষে সঙ্গত নয়। আবার ওরা আমাকে স্পাই ভাববে।

যেখানে নানা রকমের পোশাক ঝুলছে, সেখানে এসে নোরা বললো, এগুলো আমাদের জাতীয় পোশাক। অনেক পুরোনো ছবি দেখে বানানো হয়েছে।

আরও কয়েকজন সেই পোশাক সেলাই করছে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কি বিক্রির জন্য?

নোরা ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ। এগুলো বিক্রি করে টাকা তোলা হয়।

পোশাকগুলো নানারকম ঝলমলে রঙের। মেয়েদেরগুলো বেশ সুন্দর। একটা কিনে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। এদেরও কিছুটা সাহায্য করা হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কত দাম?

নোরা বললো, দুঃখিত, এটা আমরা শুধু মাকেদোনিয়ানদের বিক্রি করি। আমাদের অল্প বয়েসী ছেলে-মেয়েরা তো পুরনো ঐতিহ্য ভুলে গেছে, নিজেদের ভাষা ভুলে গেছে, এখানকার উগ্র পোশাক পরে। আমরা তাদের আবার জাতীয়তাবাদের ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। তাদের জন্য ভাষা শেখাবারও ব্যবস্থা আছে।

আধুনিক জার্মানির জীবন যাত্রার সঙ্গে মিশে গেছে যে সব ছেলেমেয়ে, তারা আবার দু' হাজার বছরের পুরোনো পোশাক পরবে, এখানকার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় একটা ভাষা শিখবে,

যে-দেশের অস্তিত্ব নেই, সেই দেশের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হবে?
সময়ের চাকাটাকে এরা ঘুরিয়ে দিতে চায়?

আমার মনে হলো, এটা নোরা, ফিলিপ আর কয়েক জনের অলীক স্বপ্ন। অলীক হলেও নিশ্চয়ই খুব মধুর। ওরা এই স্বপ্ন নিয়ে মেতে আছে। এও এক দারুণ নেশা।

একদিকের দেয়ালের পর্দা সরিয়ে ওরা আর একটা দরজা খুললো।

সেখানে একটা ছোট ঘর, কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার, ধুলোর ধোঁয়া উড়ছে। সামনে কিসের যেন একটা মূর্তি। এক পাশের জানলার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধা মহিলা, মুখের একটা পাশ শুধু দেখা যাচ্ছে। আমরা ঘরে ঢুকলেও তিনি মুখ ফেরালেন না।

বুঝলাম, এটাই ওদের মন্দির।

নোরা ফিসফিস করে বললো, উনি আমাদের মা। সকলের মা। উনি পৃথিবীর সব কিছু জানেন। ওঁর নির্দেশেই আমরা চলি।

ফিলিপ তার নিজের ভাষায় বৃদ্ধাকে কী যেন বললো। বৃদ্ধা মুখ না ফিরিয়ে সেই ভাষাতেই উত্তর দিলেন।

নোরা আমাকে বললো, মা তোমাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।

আমি বললাম, ওঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে দাও।

ফিলিপ এবার সুইচ টিপে একটা আলো জ্বালালো।

আমার বুকটা ধক করে উঠলো। সামনের মস্ত বড় মূর্তিটা আলেক্সজাণ্ডারের বুকেফেলাস নামে অশ্বের পিঠে চেপে আছেন সেই দৃপ্ত যুবা, হাতে তলোয়ার, মাথার পেছনে একটা জ্যোতির আভা।

অত্যন্ত সুদর্শন হলেও এ যে আর এক হিটলার! আলেক্সজাণ্ডারকে আদর্শ করে ম্যাসিডোনিয়ানরা কি আবার বিশ্ব জয়ের চিন্তা করছে?

আমার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে এলো, আলেকজাণ্ডারকে তোমরা সত্যিই দেবতা বানিয়ে ফেলেছো ?

বৃদ্ধা এবার মুখ ফিরিয়ে পরিষ্কার ইংরিজিতে বললেন, ইনি সত্যিই তো দেবতা। ওঁর অনুপ্রেরণায় আমরা স্বাধীন মাসেদোনিয়া ফিরে পাবো। তার বেশি দেরি নেই।

বৃদ্ধার মুখ শত কুঞ্চিত, মাথার চুল পাউডার পাফের মতন, কিন্তু চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। আমার মনে হলো, এঁর বয়েস দু'হাজার চারশো বছর। ইনিই সেই ডেলফি'র নারী পুরোহিত ॥